ॐ
সংযম সাধনা
সাধন-পথ প্রকাশন
ডি ৫৩।১০৫ ছোটী গৈবী
বারাণসী—১

সংযম-সাধনা

স্বামী বিষ্ণুপুরী

সাধন-পথ প্রকাশন
ডি ৫৩/১০৫, ছোটী গৈবী
বারাণসী—১

প্রকাশক—
স্বামী সত্য চৈতন্য পুরী
সাধন-পথ প্রকাশন
ডি ৫৩।১০৫, ছোটী গৈবী
বারাণসী-১

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

১। প্রকাশকের নিকট

২। পরমার্থ-সাধক সঙ্ঘ
উত্তর বাধার ঘাট, পোঃ অরুন্ধতী নগর
আগরতলা, ত্রিপুরা।

৩। শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত, এড্‌ভোকেট
৭১ সি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা—২৯

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট্
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

মূল্য—এক টাকা মাত্র।

মুদ্রক—
শ্রীঅমল কুমার বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
বারাণসী-২

ভূমিকা

ভারতের বিদ্যার্থী-সমাজের চারিত্রিক অধঃপতন এবং চরম উন্মার্গগামীতার আসল কারণ অসংযত জীবন।

যদি সস্নেহে পাশে ডাকিয়া তাহাদের হাতের এই বিষ বটিকাটি ভুলাইয়া ভালাইয়া কাড়িয়া লওয়া যায়, তবে অন্ততঃ কিছু যুবকেরও জীবন রক্ষা পাইতে পারে, তাহারা মানুষ হইয়া বাঁচিবার সুযোগ পাইতে পারে। এই আশায় এই সংযম-সাধনা পুস্তিকাটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কেবল যে বই লিখিয়াই নিবৃত হইলাম, তাহাও নহে। যদি ছাত্র বন্ধুগণের জীবন-গঠনে কোন ব্যাক্তিগত সমস্যা থাকিয়া থাকে, তবে তাহার সমাধান দেওয়ার জন্য ও সদা তৎপর থাকে এই পরমার্থ-সাধক সংঘ।

গীতা-প্রচার পরিষদের মাধ্যমে শত সহস্র বিপথগামী নরনারী প্রকৃত পথের সন্ধ্যান পাইয়াছে ও পাইতেছে। যাহারা সংযম-সাধনায় ব্রতী সাধক তাহারা পরমার্থ-সাধক সংঘকে তাহাদের নির্ভরযোগ্য একান্ত আশ্রয়স্থল মনে করিয়া সকল সমস্যার সমাধান চাহিতে পারেন। উত্তরের জন্য পত্রের সঙ্গে ডাক টিকিটপাঠাইতে হয়।

যাহারা সংযম সাধনার পথে জীবন গঠনের প্রচেষ্টায় এই পুস্তিকার দ্বারা কিছুমাত্রও উপকৃত হইয়াছেন, তাহারা পরমার্থ-সাধক সংঘের অফিসে বারাণসীতে নিজের নাম ঠিকানা সহিত পত্র লিখিয়া জানাইতে পারেন। আমরা আমাদের এই অভিযানের সাফল্যের একটি রেকর্ড রাখিব।

এই পুস্তিকায় নারীদেহের কিছু নিন্দাবাদ লেখা হইয়াছে। তাহাতে পাঠকবর্গের মনে এই ভাবনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে লেখক নারীজাতির অবমাননা করিয়াছেন। বস্তুত তাহা নহে। লক্ষ্মণের চরিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের, দেবী ভাবের ও মাতৃ ভাবের কথাই বরং ব্যক্ত করা হইয়াছে। যুবকগণ, নারীদেহের নিন্দাকে দৈহিক দৃষ্টিতেই গ্রহণ করিবেন মাত্র। ব্রহ্মচর্যকামী ভগিনিগণ ঐ কথাগুলি পুরুষ দেহের প্রতি অর্থারোপ করিয়া বুঝিয়া লইবেন। মোট কথা হইল নার। পুরুষের মধ্যে বিপরীত দেহের প্রতি যে এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে, তাহাতে বিকর্ষণ উৎপন্ন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। মাতৃজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর এই সমস্যাও থাকিবে না এবং এ হেন নিন্দা বাক্যের প্রয়োজনও হইবে না। চারাগাছকে বেড়া দিয়া না রাখিলে যেমন ছাগলে মুড়াইয়া খায়, তেমনি শৈশবে এইভাবে

কঠোরতা অবলম্বন না করিয়া সর্বদেহে আত্ম দর্শনের বুলি আওড়াইতে গেলে তাহাদের দুরবস্থাও অরক্ষিত চারা গাছেরই মত হইয়া থাকে।

পুস্তিকাখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখিয়া ও ছাপিয়া প্রকাশ করিতে হইল। সুতরাং তাহাতে ভাষাগত, ভাবগত, ব্যাকরণগত, ও বর্ণাশুদ্ধিগত অনেকপ্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিয়া থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। সেইজন্য আপনাদের নিকট সহানুভূতিপূর্ণ ক্ষমা যাচ্ঞা করিতেছি। ইতি

ভবদীয়

বিষ্ণুপুরী

গুরুপূর্ণিমা—

১৮৯০ শকাব্দ

সাধন-পথ প্রকাশন

ডি ৫৩।১০৫, ছোটী গৈবী

বারাণসী—১।
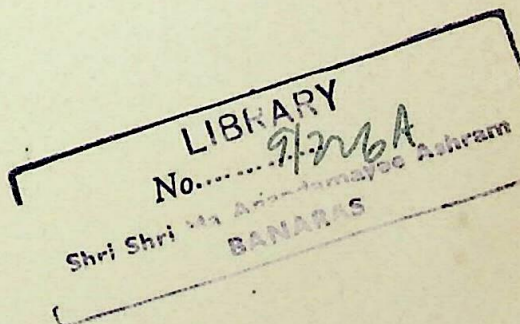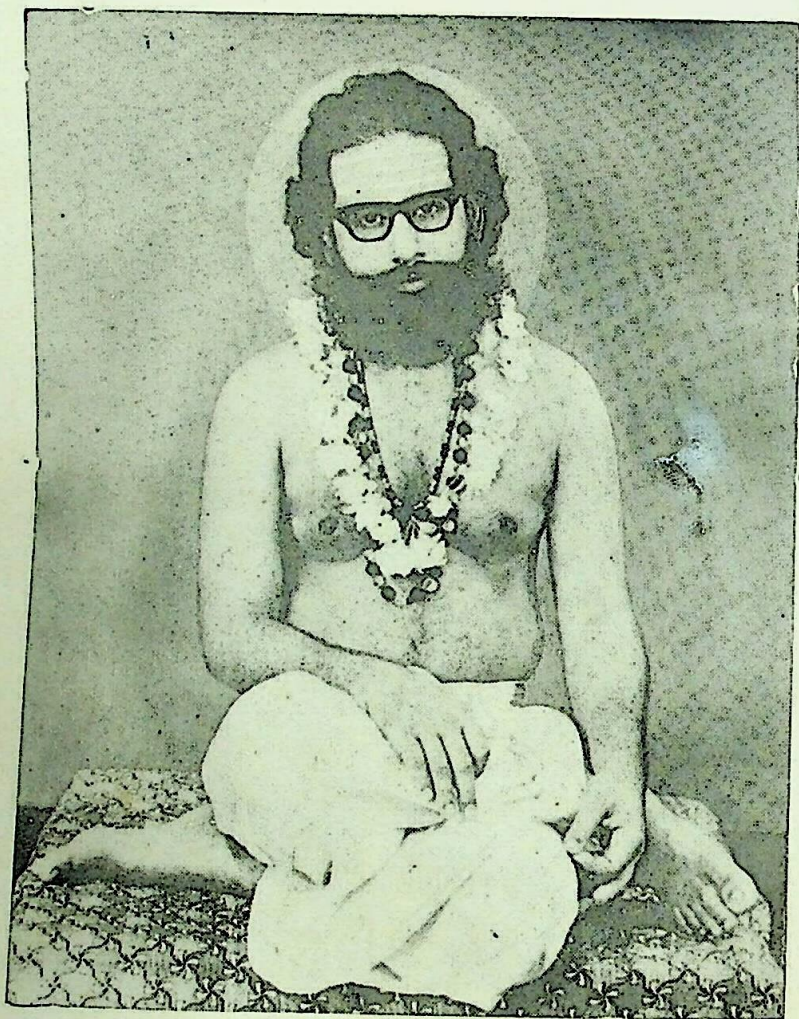
পরমহংস, পরিব্রাজকাচার্য ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী বিষ্ণু পুরী জী মহারাজ
প্রতিষ্ঠাতা—পরমার্থ-সাধক সংঘ

সংযম সাধনা

ভারতীয় জীবন ধারায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় আসিয়াছে! ত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষা লইয়া যাহাদের জীবনের জয়যাত্রা, তাহারা ভোগের কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে পথ হারাইয়াছে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী নগ্ন সভ্যতা আজ ভারতের অধ্যাত্মবাদী সত্যসাধনার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমস্যা-সঙ্কুল ভারতের পক্ষে আজ সবচেয়ে বিকট সমস্যা ঐ নিরঙ্কুশ ভোগবাদের হাত হইতে তরল মতি তরুণ সমাজের সংরক্ষণ। এই কুসুমকলি গুলির জাত ভাল। কিন্তু বিকশিত হওয়ার কোন সুযোগই আর তারা পাইতেছে না। ভোগবাদের বিষাক্ত ক্রিমি কীট তাহাদিগকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে।

ঘরে পিতামাতার চালচলন অসংযত। ভাই-বোনেরাও উচ্ছৃঙ্খল। বাহিরে বন্ধু-বান্ধবের দল রক্ত লোলুপ জোঁকের মত লাগিয়া আছে। রাস্তায়-ঘাটে সিনেমার উত্তেজক অশ্লীল চিত্রের প্রাচীর প্রদর্শনী। পুস্তকালয়ে নাটক, নভেল আর ডিটেক্‌টিভ গল্পের বাজার গরম; মন্দিরে ঠাকুর দেবতার লীলা-খেলার নামে কাম-কলার নগ্ন-চিত্রের সমাহার। পার্কে, বাগানে, নদীতীরে একান্তে বিহারের

আর উপায় নাই। সেগুলি আজ যুবক-যুবতিগণের অবাধ মিলনের মুক্তাঙ্গন। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে সর্বত্রই কানে আসে কাম কথার উন্মাদ প্রলাপ।

এমন একটা কলুষিত হাওয়া গত কয়েক দশকের মধ্যেই যেন চরমে উঠিয়াছে। যাহার গতিরোধের চিন্তায় আজ রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও চিন্তাকুল। তাহারা আইন-কানুনের বজ্র আটুনিতে এই অপরাধ প্রবণতার প্রতিবিধানের স্বপ্ন দেখেন। মৌলিক সমস্যার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। তলাইয়া দেখিবার অবসর নাই। এমন নৈরাশ্যজনক পরিবেশে যাহাদের জীবন কাটিতেছে, সেই সুকোমল কিশোর জীবনগুলি যখন যৌবনের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাদের সমস্যা-সঙ্কুল মনোবেদনা লইয়া কাহারও কাছে গিয়া সান্ত্বনা পাওয়ারও ঠাঁই নাই। লজ্জায় সরমে পিতা, মাতার কাছে তাহাদের হৃদয়ের বদ্ধ কপাট খোলে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও এই জীবন সমস্যার বাস্তব সমাধান বলিয়া দিতে অনভিজ্ঞ বা অনুৎসাহী। এমন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে ঐ বেদনা পীড়িত হৃদয়গুলির আশ্রয় কোথায়? তাহাদের এমন যথার্থ বন্ধুই বা কে আছেন, যাহারা তাহাদিগকে অভয় দিবেন। সস্নেহে পাশে বসাইয়া গভীর সমবেদনায় তাহাদের চরম অধঃপতনের ইতিকথাগুলি শুনিবেন ও

সমাধান বলিয়া দিবেন। এই পিচ্ছিল পথে পদস্খলিত তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তুলিয়া আগাইয়া চলিতে সাহায্য করিবেন ?

যেমন কুসঙ্গে পড়িয়া পতন ঘটে, তেমনি উপযুক্ত সুসঙ্গ পাইলে তাহাদের জীবনে পরিবর্ত্তন আসা অসম্ভব কিছুই নয়। তেমন পরিবেশ সৃষ্টিই আজ নিতান্ত আবশ্যক। আজ তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অনেকেই অনুভব করি-তেছেন ঋষিকুল বা গুরুকুল পদ্ধতিতে আশ্রম পরিবেশে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগে ভারতের শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানগুলি ছিল জনপদ হইতে দূরে গৃহস্থ পরিবেশ মুক্ত পবিত্র আবহাওয়ায় সংস্থাপিত। সেখানে পঞ্চম বৎসর বয়সেই বিদ্যার্থিগণের আগমন ঘটিত। গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন সর্বপ্রকার ভোগমুক্ত শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ। সেই আদর্শে দীর্ঘ ১৫ হইতে ২০ বৎসর কাল বিদ্যাধ্যয়নের পরে তাহাদের গৃহস্থাশ্রমে সমাবর্তন হইত। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তাহাদের আর বেতালে পা পড়িত না। শাস্ত্রীয় মর্যাদার মধ্যেই তাহাদের সেই ভোগবাসনা সীমাবদ্ধ থাকিত। প্রতিপদে শাস্ত্রের এবং সমাজের অমোঘ অঙ্কুশে তাদের জীবন থাকিত মর্যাদিত ও সুনিয়ন্ত্রিত।

যথাসময়ে তাহারা সাংসারিক পরিবেশ হইতে অক্লেশে বাহির হইয়া আসিবার মনোবল পাইত এবং সেই কারণেই সমাজে নিঃস্বার্থ সমাজ সেবী লোকের কোন কালেই অভাব ঘটিত না। জীবনের শেষাংশে তাহারা হইতেন মোক্ষমার্গী সন্ন্যসী। আর্যজীবনের উপক্রম হইত ধর্মের ভূমিকায় আর উপসংহার মোক্ষের মহানির্বাণে। মাঝখানের ঐ যে সাংসারিক জীবনটুকু, তাহা কেবল অনন্ত জন্মের উচ্ছৃঙ্খল ভোগ বাসনাকে এক কেন্দ্রিক করিয়া লইয়া বিষয় বিতৃষ্ণ হওয়ারই জন্য।

ভারতের সেই সুপরিকল্পিত জীবন শৃঙ্খলা আজ আর নাই। গুরুগৃহে যে ভূমিকা রচিত হইত, তাহারই উপর সংস্থাপিত হইত জীবনের এক পবিত্র দেবালয়। আজ সে ভূমিকাহীন জীবন যাত্রা যেন বালির উপর নির্মিত উত্তুঙ্গ অট্টালিকা। আজ আবার আমাদিগকে নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে আমাদের আর্য জীবনের সেই আদর্শের কথা। ভারতের মানুষ ভুলিতে পারে না তাহাদের গোত্র পরিচয়। তাহাদের ধমনীতে ধমনীতে আজও যে প্রবাহিত হইতেছে সেই ব্যাস, বশিষ্ঠ, কপিল, কণাদ আদি ঋষি মহর্ষিগণেরই পবিত্র শোণিত ধারা। সুতরাং সেই আর্য জীবন যাপন প্রণালীর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা অনুরাগ থাকা

একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মত আজ আর কেহই নাই। আজিকার শিক্ষা প্রণালীতে তেমন কোন ব্যবস্থাই স্থান পায় নাই। আজ আমরা নিজের ঘরে লুক্কায়িত অমূল্য রতনের সন্ধানে আগ্রহী নই। কেবল ভিক্ষা পাত্র হাতে লইয়া পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারে দ্বারে শিক্ষা সংস্কৃতির ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেছি। এই দেশের ভূমিতে যাহা অনুকূল নহে, তাহাকেই জবরদস্তী গলাধঃকরণ করাইতে কর্তা-ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার ত্রুটি নাই। কিন্তু পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে ভারতের চিন্তাশীল মনীষীদের মন আজ এই পরিস্থিতির নিরসনের জন্য বিদ্রোহী হইয়া গুমরাইয়া মরিতেছে। তাহাদের সেই অন্তর্বেদনা প্রকাশের ভাষাও নাই, সুযোগেরও নিতান্তই অভাব।

আজ আমরা যেই পরিস্থিতিতে আছি, সেই পরিস্থিতি লইয়াই বিচার প্রয়োজন। এই বক্তব্য আজ আর কাহাকেও লইয়া নয়। আমার এই আহ্বান শুধু দিব্য-জীবন যাপনে উৎসাহী তরুণপ্রাণ ছাত্র বন্ধুদের প্রতি। দেশের তথাকথিত নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়াও যাহারা জীবনে উপদেশকের ভূমিকায় আসিয়া অভিনয় করিয়াছেন তাহাদের অনেকেই

পরোপদেশে পণ্ডিত। তাহাদের স্বকীয় জীবনে হয়ত তাহাদের বক্তব্য উপদেশের প্রতিফলন তোমরা দেখিতে পাও নাই, তাই বিতৃষ্ণায় ও অবিশ্বাসে তোমাদের মন ঐ সকল উপদেশকে উপেক্ষা করিয়াছে। চল আজ আর উপদেশ নয়; কিছু কিছু অনুশীলন করিয়া দেখি।

তোমাদের কিশোর জীবনের সমস্যার কথা জানি। তোমরা মুখ ফুটিয়া না বলিলেও তোমাদের জীবন সমস্যামুক্ত মোটেই নয়। প্রথম সমস্যাই হইল সংযম সাধনার। কৈশোর অতিক্রম করিয়া ১৫।১৬ বছর বয়সে যখন যৌবনের সীমাক্ষেত্রে আসিয়া পদক্ষেপ করিলে, তখন তোমার জীবনে কোথা হইতে যেন এক আনন্দের জোয়ার বহিয়া আসিল। তুমি তাহাকে চিন না। কিন্তু সেই আনন্দের শিহরণে মন প্রাণ আপ্লুত, প্রকৃতির শ্যামলতা, পবনের মৃদুলতা, বর্ষার ঘনঘটা, বসন্তে পাপিয়ার কুহুতান, সব কিছুতেই যেন প্রাণে জাগায় এক আনন্দের শিহরণ। এমনটি আগে হইত না, কিন্তু এখন হয়। কি কারণে যে হয় সেই সন্ধান তুমি হয়ত রাখ না। হে কিশোর! তোমার জীবনে যার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তিনি তোমার জীবন দেবতা, অমিত বীর্য। তোমার ভুক্ত দ্রব্যের অন্তিমতম পরিণতি। বালক শরীরে তাহা এই অন্তিম স্তরে উন্নীত

হইত না। আজ এই প্রথম হইতে আরম্ভ করিল। আর সেই উৎসবেরই আনন্দে তোমার এই দেহ সাম্রাজ্যের ইন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি কর্তা ও অধিকর্তাগণ আনন্দমুখর, ছন্দিত ও স্পন্দিত। তাহার সংরক্ষণ যেন তোমার জীবনের পবিত্র ব্রত হয়। এই বিন্দু-বরণের প্রাচীন শাস্ত্রীয় নাম ব্রহ্মচর্য।

যাহার জীবনে এই ব্রহ্মচর্য অখণ্ডিত ভাবে রক্ষিত হয়, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহার সুপ্রতিষ্ঠা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অমিত মেধা, নির্ভুল বোধশক্তি, কর্মে উদ্দীপনা, সৎ সাহস সব কিছুই যেন তাহার নিত্য সহচর হইয়া উঠে। তোমার সহজাত রূপ যতই কুরূপ হউক না কেন, কিন্তু সেই নবাগত শুক্র-শক্তিতে তাহা হইয়া উঠিবে কোমল, কমনীয়। চোখের দীপ্তি অভিভূত করিবে সঙ্গী-সহচর সকল ব্যক্তিকে। স্বভাবে, চরিত্রে গাম্ভীর্যের ছাপ ব্যক্তিত্বের প্রভাব আনিয়া তোমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতার আসনে।

হে কিশোর! এমন দেব-দুর্লভ তোমার জীবন দেবতার শুভ পদার্পণে তুমি ব্যাকুল হইয়া উঠিও না। মনে রাখিও ব্রহ্মচর্যেই ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মচর্যের ব্যাপক অর্থ সমাধি অবস্থায় সাধকের ব্রাহ্মীস্থিতি। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তাহার অর্থ হইল **বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্।**

কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই হউক আর সাধন ক্ষেত্রেই হউক, বীর্যবানের নিকট সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে ! পুরাণের রূপকথায় বহুস্থলে দেখা যায়, যোগীর যোগ বা সাধকের উগ্র সাধনায় দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। এই বুঝি তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্রত্ব হাতছাড়া হইয়া গেল। এই ভয়ে তিনি পুষ্পধন্বা কামদেবকে নিযুক্ত করিতেন সাধককে সর্বস্বান্ত করিতে। একবার ব্রহ্মচর্য খণ্ডিত করাইতে পারিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। যোগীর যোগই বল, জ্ঞানীর জ্ঞানই বল, আর ভক্তের ভাবাবেশই বল, ব্রহ্মচর্যের অভাবে সব কিছুরই সমাধি ঘটিয়া যায়। সেইজন্যই শাস্ত্রকার ঘোষণা করিয়াছেন—

নতপস্তপইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু সদেবঃ নতু মানুষঃ ॥

অর্থাৎ—বহুবিধ অন্য তপস্যা বাস্তবিক পক্ষে তপস্যাই নয় ; যদি না অখণ্ডতঃ ব্রহ্মচর্য প্রতিপালিত হয়। ব্রহ্মচর্যই সকল তপস্যার শিরোমণী। ঐ একবিন্দু শুক্রের মূল্য সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দ্বারাও চুকান যাইবে না। রাজার রাজত্ব, ধনরত্ন, মণিমাণিক্য. ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বও ঐ একবিন্দু শুক্রের সমতুল্য হইতে পারে না। ঐ অমূল্য ধনে যিনি ধনবান, তাঁহার নিকট সবকিছুই তুচ্ছ।

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ॥

দেহের অবসানকেই না তুমি মৃত্যু বল ? আর সেই মরণ তোমার কাছে কতই না বিভীষিকাপূর্ণ। মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীতি বিহ্বল প্রাণীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখ ; তোমার কঠিন প্রাণেও করুণার সঞ্চার না হইয়া পারিবে না। বলির পাঠার মত এক ফুৎকারে একটি প্রাণ প্রদীপের নির্বাপণ যদি বেদনাদায়ক হয়, তবে তিলে তিলে, পলে পলে, ঐ বিন্দুর ক্ষরণ জনিত মহা মৃত্যু ? তাহা যে কত ভয়ানক, একবার ভাবিয়া দেখ। কোন কারণে কিঞ্চিৎ মাত্র রক্তপাত ঘটিলে তুমি বিচলিত হইয়া পড়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ঐ এক বিন্দু শুক্র ক্ষরণেই তুমি কত কিছু হারাইয়া ফেলিলে ?

একদিনের ভুক্ত অন্ন প্রথমে রসে, তারপরে রক্তে, ক্রমে ক্রমে মাংসে, মাংস হইতে অস্থিতে, অতঃপর মজ্জায় এবং সর্বশেষে শুক্রে গিয়া পরিণত হয়। একবার স্বপ্নজনিত শুক্র ক্ষরণে যে পরিমাণ বীর্য নষ্ট হয়, তাহা উৎপন্ন হইতে প্রায় এক দেড় মন অন্নের দেড়মাস সময় লাগে। একবেলা অনাহারে থাকিলে মানবের শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, চোখে সরষেফুল দেখা যায়। আর এক কালিন এতদিনের সঞ্চিত সেই মহামূল্য শুক্র ক্ষরণের পরিণতির কথা ভাবিয়া

দেখিয়াছ কি ? কতরক্তের প্রয়োজন হইয়াছিল অতটুকু শুক্র প্রস্তুতিতে। তত রক্তের ক্ষরণ যদি এক সাথে দেখিতে নিশ্চয়ই মূছিত হইতে এবং জাগিয়া উঠিতে কিছুদিন সময় লাগিত। জীবন হইত সঙ্কটাপন্ন। আর তুমি কিনা ক্ষণিকের কুহকে, বন্ধুর প্ররোচনায় বা কুসঙ্গের কুফলে হেলায় খেলায় সেই শক্তিকে ধূলিস্মাৎ করিয়া দিলে ? ভাবিলেও ভয়ে দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠে। স্মৃতি, মেধা, ধৃতি এক মূহুর্তে অন্তর্হিত হইল, তোমার ঐ জঘন্য ভ্রান্তির বশে। ব্যাটারী দেখিয়াছ কি ? যাহাতে বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হয়। ঐ বিদ্যুতের সাহায্যে কত অসাধ্যই না সাধিত হইতেছে সংসারে। কিন্তু সেই ব্যাটারীতে যদি এসিডই না থাকিল, বিদ্যুতের সংরক্ষণ ঘটিবে কোথায়। তোমার এই দেহটিকেও একটি অভিনব ব্যাটারী যন্ত্র বলিয়া মনে কর। সৌর তেজের মধ্য হইতে, ঈথরের তরঙ্গ হইতে, পারিপার্শ্বিক নৈসগিক পরিবেশ হইতে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে তোমার দেহে। তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে ঐ অমূল্য শুক্রশক্তি। যদি তুমি তোমার সেই শক্তি নিঃশেষে খালি করিয়া ফেলিলে, তবে শক্তি সংরক্ষণের আধার কোথায় ? তোমার যে সবই গেল। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের যে আশা

পোষণ করিয়া চলিতেছিলে, উন্নতির যে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলে মূহুর্তে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

হে কিশোর, নিজের হাতে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিও না। তোমার সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া জীবনের যথা সর্বস্বরূপ শুক্র সঞ্চয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। কেবল ছয়টি মাস পরম নিষ্ঠার সহিত তুমি অস্খলিত থাক, দেখিবে "ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ" ঋষি পাতঞ্জলির এই মহাবাক্য কেমন অভ্রান্ত সত্য। তোমার দেহ ইন্দ্রিয় মন, প্রাণে এক অমিত তেজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। মাত্র একটি বার পড়িলে বা শুনিলেই অনেক গভীর তত্ত্ব বা তথ্য তোমার স্মৃতিপথে চিরদিনের জন্য গ্রথিত হইয়া থাকিবে। তোমার বুদ্ধি অনাগত ভবিষ্যতের অনেক তথ্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইবে। তোমার চরিত্র জ্ঞানে গুণে সমলঙ্কৃত হইয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিবে। পক্ষান্তরে বীর্য স্খলনের কুপরিণাম একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? তোমার দেহ সৌষ্ঠব এক মুহূর্তেই কর্পূরের মত কো'থায় উড়িয়া গেল। প্রস্ফুটিত কমল-পাপড়ীর মত, তোমার ভাষাভাষা টানাটানা নয়নযুগল কোটরাগত হইল। দৃষ্টির তেজস্বীতা স্তিমিত হইয়া গেল। চোখের চারিপাশে কে যেন কলঙ্কের মসি লেপন করিয়া গেল তোমার অজ্ঞাতে। চন্দ্রের মত

সুনির্ম্মল তোমার মুখমণ্ডলে তোমার গোপন পাপের কলঙ্ক কালিমা ফুটিয়া উঠিল অসংখ্য দুষ্ট ব্রণের আকৃতি লইয়া। শরীর হইল ক্ষীণ, কণ্ঠকূপ বসিয়া গেল, উঠিতে বসিতে অবসাদ, কাহারও সমক্ষে গিয়া দাঁড়াইতে অপরিসীম এক লজ্জাবোধ, কাজে কর্মে পড়াশুনায় উৎসাহের অভাব, সর্বস্বান্তের মত এক নিরাশভাবে হৃদয়খানা সর্বদার তরে আচ্ছন্ন, হয়ত অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছ হঠাৎ উঠিবা মাত্রই ত্রিভুবন যেন অন্ধকার হইয়া আসে। মাথা ঘুরিতে থাকে, কিছুই হজম হয় না, জীবন যেন এক দুর্বিসহ বোঝা। ক্ষণিকের কল্পিত সুখের পরিণামে এই অপরিমিত দুঃখ বরণ করিয়া তুমি কি পাইলে বল। তাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, সংযত হও, মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচ।

কঠোর ব্রত

সংযম সাধনার পথে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি। তোমার অনিয়ন্ত্রিত জীবনকে ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চল। একদিন তোমার সাধনা সিদ্ধ হইবে।

আহার

‘জীতং সর্বং জিতে রসে’

যদি একবার রসনাকে বশে আনিতে পার, তুমি বিশ্বজিৎ হইবে। তোমার দুই দুইটি ইন্দ্রিয়েরই একটি একটি কাজ।

এই নিরস্থি রসনার কাজ কিন্তু দুইটি, চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ষড়রসের আস্বাদন, দ্বিতীয়তঃ হৃদয়ের ভাব ব্যঞ্জনা। এক কথায় ভোজন আর ভাষণ। এই রসনাকে সংহত করিতে গেলে, কেবল আহার সংযমী হইলেই চলিবে না। বাক্ সংযমের ও একান্ত প্রয়োজন। জগতের অধিষ্ঠানরূপ দেবাদিদেব মহাদেবকে আচ্ছাদন করিয়া আছেন মহাকালী। এই মহা-কালীই মহামায়া। মহামায়ার সেই দিগম্বরী স্বরূপের ব্যাখ্যা জান কি? তিনি লোলজিহ্বা প্রসারিত করিয়া এবং সদা দিগম্বরী থাকিয়া বিশ্ববাসীকে শুধু একটি কথাই বুঝাইয়া দিলেন, যে এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের উপর যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।

জিহ্বোপস্থঃ জয় ধৃতিঃ

জিহ্বা এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ বিজয়ের নাম ধৃতি। রসনা জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার কাজ হইল রসের আস্বাদন আর উপস্থ কর্মেন্দ্রিয় তাহার কর্ম রসের পরিত্যাগ। তুমি রসনার উপর প্রভুত্ব পাইলে উপস্থোন্দ্রিয়ের উপর বিজয় লাভ অনায়াসেই হইয়া যাইবে।

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব গ্রন্থিণাং বিপ্র মোক্ষঃ॥

আহার শুদ্ধিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তের শুদ্ধতায়

আসে স্বরূপ স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি লাভে সকল প্রকার সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়।

আহার তিন প্রকার

রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

যে সকল আহার আয়ু, উদ্যম, বল, আরোগ্য, সুখ-শান্তি ও প্রীতি বৃদ্ধির কারণ এবং যাহা রসযুক্ত স্নিগ্ধ পুষ্টিকর এবং মনোরম এমন আহারই সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥

যে সকল আহার দুঃখ শোক এবং রোগ সৃষ্টি করে এবং যাহা অতিশয় তিক্ত, অম্ল, লবণাক্ত, অথবা অত্যন্ত গরম, ঝাল, বিশুষ্ক বা প্রদাহকর, সেগুলি রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় খোরাক হয়।

যাতযামং গতরসং পূতি পয র্ষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

অপক্ক, রসহীন্, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী, উচ্ছিষ্ট এবং যজ্ঞে নিষিদ্ধ বস্তুর আহার তামসিক ব্যক্তিগণের প্রিয় হইয়া থাকে। হে কিশোর, যদি ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা তোমার জীবনের ব্রত হইয়া

থাকে, তবে কেবল মাত্র সাত্ত্বিক আহারই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। মাছ, মাংস, ডিম, পিয়াঁজ, রশুন মানব মনে এক বিকৃতি আনিয়া দিবেই দিবে। আয়ুর্বেদের মতে প্রত্যেক বস্তুরই কিছু না কিছু দ্রব্য গুণ আছে—

ভাং খাইলে যেমন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তেঁতুল খাইলে তেমনি সেই ঘোর কাটিয়াও যায়। বেগুন যেমন পিত্ত বর্ধক, করলা তেমনই পিত্তের প্রশমক, সুতরাং যে সকল আহার তোমার দেহ তন্ত্রকে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, অতিশয় সতর্কতার সহিত তুমি সেই সকল আহারকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর। আধুনিক চিকিৎসকের পরামর্শে মোহিত হইয়া উত্তেজক টনিক জাতীয় বিষ গলাধঃকরণ করিও না। তাহা তোমার স্নায়ু মণ্ডলীতে ক্ষণিকের উত্তেজনা আনিয়া দিবে মাত্র। তুমি তাহারই ফলে কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া থাকিবে তোমার স্নায়বিক দুর্বলতার প্রভাবকে। কিন্তু তোমার দেহ মনে উত্তেজনার সঞ্চার করিয়া তাহা তোমাকে সর্বনাশের গহীন গভীরে ঠেলিয়া দিবে মাত্র। হে কিশোর, শরীরে যদি দুষ্ট ব্রণ বিষাক্ত হইয়া পচিয়া উঠে, তবে সুগন্ধিত প্রলেপে কি তার নিরাময় ঘটা সম্ভব হয়? নিরাময় একান্তই আন্তরিক ব্যাপার, সুতরাং তোমার এই ক্ষণিক ভুল ভ্রান্তি জনিত কঠিন বা কুৎসিৎ রোগের চিকিৎসা

কেবল মাত্র ঔষধ পথ্যেই হইবে না। যেমন বীজ হইতেই বৃক্ষের সৃষ্টি, তেমনই কারণ হইতেই হয় কার্যের বহির্বিকাশ। যেই কারণে তোমার এ হেন অধঃপতন সেই কারণকে খুঁজিয়া বাহির কর। ভীষ্মের মত কঠোর সঙ্কল্প বলে সেই কারণের উন্মুলন সাধনে কটিবদ্ধ হও। দেখিবে রোগের নিরাময় ঘটিয়াছে। সংযম সাধনায় আহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেবল তাহার প্রকারই নয়, পরিমাণের উপরও দৃষ্টি দিতে হইবে। কোন উৎসবে বা সমারোহে রসনা রঞ্জনের জন্য আকণ্ঠ আহার যে কি সর্বনাশ ডাকিয়া আনে, তাহা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবিয়া দেখ। উত্তেজক পদার্থ তোমার স্নায়ু তন্তুগুলিকে উত্তেজিত করে, আর সেই ভয়ে তুমি সকল প্রকার রাজসিক আহার হয়ত পরিত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু সাত্ত্বিক আহার মনে করিয়া ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত বা ঐ রকম অন্য কোন আহার্য মাত্রার মর্যাদা ডিঙ্গাইয়া দেহ পুষ্টির আশায় গোগ্রাসে গিলিয়া চলিতেছ। পরিণাম অতীব ভয়ঙ্কর। সুতরাং আহারের সময়ে পরিমাণের কথা ভুলিলে চলিবে না।

অর্ধং সব্যঞ্জনাস্য তৃতীয়োমোদকস্য তু।
বায়োঃ সঞ্চরনার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

অর্থ :—অন্ন ব্যঞ্জনের দ্বারা উদরের অর্ধভাগ এবং

জলের দ্বারা এক চতুর্থাংশ পূর্ণ করিবে, অবাশষ্ট এক চতুর্থাংশ বায়ু সঞ্চরণের জন্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। মনে রাখিও তোমার ভুক্ত অন্নের এক কণিকাও যেন তোমার হজম শক্তির অভাবে অপাচ্য অবস্থায় বাহির হইয়া না যায়। শীতের সময়ে খেজুর গাছের রসের হাঁড়ি দেখিয়াছ? বিন্দু বিন্দু রস ক্ষরণে প্রাতঃকালে ঘড়াটি কেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু ঘড়া যদি ছিদ্রযুক্ত হয়, তবে বিন্দু বিন্দু তো দূরের কথা কলস উজাড় করিয়া ঢালিলেও ফুটো ঘড়াতে জল দাড়াইবে না। অধিকতর আহারই যে দেহের বলিষ্ঠতার কারণ, এহেন ধারণা একান্তই ভুল। তোমার দরিদ্র মা-বাপের সাধ্যানুকুল আয়ের মর্যাদার মধ্যে থাকিয়া শাকান্ন আহারেও তোমার দেহে শক্তির কিছুমাত্র ন্যূনতা ঘটিবে না, যদি তোমার ব্রহ্মচর্য অস্খলিত থাকে। আর অপর পক্ষে পুষ্টিকর আহার্যের প্রাবল্যের মধ্যেও স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি ঘটিবে, না যদি ব্রহ্মচর্য রক্ষিত না হয়। সুতরাং হে কিশোর, মনে রাখিও আহার জীবন ধারণের জন্য, আহারের জন্য জীবন নয়। তোমার জীবনের মূল্য অনেক। কে কত খাইল আর কি খাইল, তাহার তালিকা দেখিয়া কোন মহাপুরুষেরই জীবনের মূল্যাঙ্কন হয় না। বরং এ জগতে কার জীবন কতটুকু ভোগমুক্ত রহিয়াছে, তাহা-

2

দেরই হিসাব নিকাশ পুরাণের পাতায় পাতায়। তোমার জীবনাদর্শ ভোগ-লম্পটের কদর্য জীবন হইবে কেন! আহার শুদ্ধির প্রতি তোমার সতর্ক দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। দিনে যদিও বা ভরপেট আহার করিলে, কিন্তু রাত্রের আহার খুবই সহজ পাচ্য এবং স্বল্প হওয়া প্রয়োজন। সারাদিনের পরিশ্রম মধ্যাহ্নের আহার্যকে পরিপাক করিতে সাহায্য করে। কিন্তু নৈশ নিদ্রায় সেই সুযোগের অভাব ঘটে বলিয়াই রাত্রির আহারের বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। এই গেল আহারের প্রকার ও পরিমাণের কথা। কিন্তু আহার শুদ্ধিতে এই দুটি কথাই যথেষ্ট নয়।

আহারের প্রস্তুতি (রান্না)

স্থান কাল এবং অন্নের উপার্জন শুদ্ধির প্রতিও শ্যেন-দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন ঃ—ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ। অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে উৎসর্গ না করিয়া অথবা নৃ যজ্ঞাদি বিবর্জিত হইয়া যে কেবল আত্ম-তৃপ্তির জন্যই আহার করে, সে পাপভুক। পক্ষান্তরে "যজ্ঞ-শিষ্টামৃত ভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। (গীঃ) অর্থাৎ ভগবদ্ উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রসাদরূপ অমৃত যিনি সেবন করেন,

তিনি সনাতন ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্যই ব্রহ্মচর্যাভিলাষী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রসাদভোজী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবেই আহারের সর্ববিধ অশুদ্ধি দূরীভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি রান্না করেন, তার শুচি-শুদ্ধতা এবং মানসিক বৃত্তির প্রতিক্রিয়া অন্নে সংক্রামিত হয়। যিনি পরিবেশন করেন, অন্ন তার প্রভাব থেকেও মুক্ত থাকে না। ভোজন এবং রান্নার স্থানটি যদি শুচি-শুদ্ধ না হয়, তবে তজ্জনিত প্রতিক্রিয়াও মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। সেই জন্যই আহারের পূর্বে ভোক্তা হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া ব্রহ্মার্পণের দ্বারা নিবেদিত অন্ন আহার করিবেন। চেয়ার টেবিলে কাটা চামচের সাহায্যে আহারের যত প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তিই থাকুক না কেন, তার মধ্যে পাশ্চাত্য সাহেবিয়ানায় রজোগুণের উন্মেষ না হইয়া যায় না। অন্নশুদ্ধির বিষয়ে আরও একটি কথা বিশেষ অনুধাবনীয় যে ভুক্ত অন্ন যদি ন্যায় উপার্জিত না হয়, তবে যত গঙ্গাজলই ছিটান হউক না কেন, অন্নশুদ্ধির আর কোন আশাই থাকে না। হে কিশোর, তোমাদের জীবন হয়ত এখনও স্বাবলম্বী হইয়া উঠে নাই। সুতরাং সর্বপ্রকার দোষমুক্ত আহারের আশা করা যায় না। কিন্তু প্রসাদভোজী

স্বগতভাবে সকল প্রকার দোষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন।
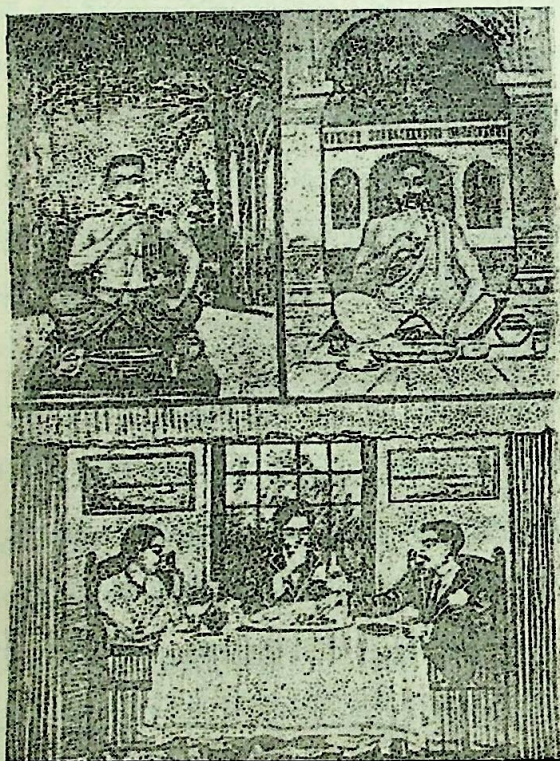
(১) সাত্ত্বিক, (২) রাজসিক ও (৩) তামসিক আহার

অন্নের গলাধঃকরণই শুধু আহার নয়। ব্যাপকার্থে "আহরণাৎ আহারঃ"। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মারফতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি যা কিছু আহরণ কর, সবই আহারের

অন্তর্গত। পূর্বাধ্যায়ে শুধু রসনা গ্রাহ্য আহারের কথা আলোচিত হইল। এবার নেত্রগ্রাহ্য আহারের কথাও চিন্তা কর। হে কিশোর! মনে রাখিও "দৃষ্টিরেব সৃষ্টিঃ"। তুমি যেই দৃশ্যকে যেই ভাবে দেখ, সেই ভাবেই রূপায়িত হয় তোমার মন। যদি দৃষ্টি সংযম করিতে পার, তবে তোমার মনকে বিক্ষুব্ধ করে কার সাধ্য। "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ"; বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যখন ঘটে, তখনই বিষয় ভোগের দুর্দমনীয় কামনা ফণা উদ্যত করিয়া দংশনোন্মুখ হয়। তুমি যদি তা থেকে আত্মরক্ষা করিতে কৃত সঙ্কল্প হও, তবে হাটে, মাঠে, ঘাটে, স্কুল-কলেজে যেখানেই থাক না কেন, তোমার দৃষ্টি যথাসম্ভব ভূ সংলগ্ন করিয়া রাখিও। তুমি অনেক আবিলতার হাত হইতে রক্ষা পাইবে। ঋষ্যমুখ পর্বতে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ যখন সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন সুগ্রীব শ্রীরামের সমক্ষে সীতা মাতার বস্ত্রালঙ্কার উপস্থিত করিয়াছিলেন। চির পরিচিত জানকীর সেই পট্টবস্ত্র চিনিয়া নিয়া শ্রীরাম হইয়াছিলেন শোকাকুল। লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া যখন তিনি বলিয়াছিলেন—ভাই, এই অলঙ্কার কি সীতার? ব্রহ্মচর্যের মূর্ত্ত-প্রতীক লক্ষ্মণ বিনীত উত্তরে শুধু এ কথাটুকু বলিয়াছিলেন, "নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানামি কুণ্ডলং, নূপুরমেব

জানামি নিত্যপাদাভিবন্দনাৎ"। অর্থাৎ—দাদা, সীতা মাতার চরণাশ্রিত নূপুর ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অলঙ্কারই আমি চিনি না। প্রাত্যহিক চরণবন্দনার সময়ে ঐ নূপুরের সঙ্গে আমার পরিচয়। হে কিশোর! দৃষ্টি সংযমের এ হেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাইবে বল? চোখের চিরন্তন আত্মীয়তা রূপের সঙ্গে, যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে চোখই চঞ্চল হইয়া উঠে সকলের আগে। মনের চাঞ্চল্যের বহিঃ-প্রকাশ হয় দৃষ্টির মাধ্যমে। যদি দৃষ্টি বশে রাখিতে পার, মনও বশে আসিবে। কিন্তু সব সময়ে তা সম্ভব হয় না। কর্মেন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক দৃশ্যই চোখে পড়িয়া যায়। তখন দৃষ্টি সংযমেই কাজ চলে না। বিচার বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন আসিয়া পড়ে।

"রূপ"

হে কিশোর, যেই রূপের ক্ষণিক চাক্‌চিক্যে তোমার চিত্তবৈকল্য; সেই রূপের বাস্তব স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছ কি? ফুল্ল-কুসুমিত কমল বন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন বিকশিত হইতে আরম্ভ করে, লক্ষ্য করিয়াছ কি? সন্ধ্যা সমাগমে দেখিয়াছ কি তার শুঁটিয়ে যাওয়া বিমর্ষরূপ! তোমার এই দেহরূপ নন্দন বনে যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে

বলিয়া যে দেহ সৌষ্ঠব নিয়া তোমার গৌরব, তার মূল উৎস কোথায় একবার ভাবিয়া দেখ। ঐ সৌন্দর্য কৈশোরে কমনীয়তা নিয়া আসে, কিন্তু কদিনই বা তার স্থায়ীত্ব? সুতরাং এই নশ্বর যৌবনের চাঞ্চল্য জীবনের অমূল্য সম্পদকে বিনষ্ট করিয়া দিও না। তুমি হয়ত বলিবে নিজের সৌন্দর্যে মন আমার আকৃষ্ট মোটেই নয়, কিন্তু নারী দেহের সৌন্দর্যের পেছনে মনের যে উন্মত্ততা তা কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারি না। বেশ ভাল কথা, নারী দেহের সৌন্দর্য নিয়াই না হয় একটু আলোচনা হউক।

বল, তোমার মোহের কারণ সমূহ একবার বর্ণনা করিয়া বল ; কবিকুল চিরকালই বিধুবদনী বলিয়া রমণীকুলের মুখমণ্ডলের উপমা চন্দ্রের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছে, চোখের উপমা দিয়াছে কমলের সঙ্গে। উপমার অলঙ্কারে তারা তিলকে তাল করিয়াছে ; রজকে গজ করিয়াছে ; কিন্তু ঐ বিধুবদনের সৌন্দর্য যদি দেখিতে হয়, তবে প্রাতঃকালে একবার ঘুম ঘোরে হতজ্ঞান সুন্দরীর মুখখানা দেখিয়া আস। যেই নেত্রের তুলনা কমলের সঙ্গে দিয়া আহামরি আহামরি করিয়াছিলে, সেই চোখের কোণের পিচুটি, বদনের নিঃসৃত লালার কদর্য রূপ দেখিয়া তোমার আর ঐ আহামরি প্রশংসা সূচক শব্দ নিসৃত হইবে না। যেই দেহের পেছনে

পাগল হইয়া ছুটিয়াছ, মনে মনে একবার সেই দেহটির উপর অস্ত্রোপচার (post mortem) করিয়া দেখ দেখি, কোন অংশটি তোমার সুন্দর বলিয়া মনে হয়? যদি বল ওর ঐ কুরঙ্গ বিনিন্দিত নয়ন যুগলের পেছনে আমি দিওয়ানা। বেশ ভাল কথা, চোখ দুটি তুলিয়া তোমাকে উপহার দিলে কি তুমি পরিতৃপ্ত? তখন হয়ত ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া ছি ছি বলিয়া দূরে ফেলিয়া দিবে ঐ নিষ্কাষিত চোখের ঢেলা দুটি। যেই দেহ সৌষ্ঠবের প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ, একবার সোনার বরণ সেই চর্ম্মা-বরণটুকু টানিয়া নিয়া দেখ, তার অন্তরালে কোন কোন রতন মাণিক লুকান আছে। স্নান করিয়া ঘরে ফেরার পথে পূতিগন্ধ পূর্ণ কোনও মাংস পিণ্ডে বা অস্থিখণ্ডের যদি স্পর্শ ঘটিয়া যায়, ছি ছি বলিয়া হয়ত আবার ফিরিয়া যাইবে নদীর ঘাটের দিকে, একটি ডুব দিয়া শুদ্ধ হইয়া নিতে। ততটা শুচিবাই যদি তোমার কাছ থেকে আশা করা নাও যায়, তবে আধুনিক বিজ্ঞান পরস্ত যুবকও সাবান জলে কয়েকবার হস্ত প্রক্ষালনে বিরত হইবে না। কিন্তু হে অন্ধ, তোমার ঐ প্রিয়তমার দেহ কঙ্কাল কি তোমার নজরে পড়ে না?

মূত্র পুরীষে, কফ, পিত্ত, রুধির, ও স্নায়ুলতায় কদর্য

জঠরপিণ্ডে পরিপূর্ণ এই দেহের কোন্ অংশটি পাইলে তুমি সন্তুষ্ট ? ঘণ্টা দুই পরে যেই দেহের পূতিগন্ধে তোমার ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিবে, লক্ষ লক্ষ ক্রীমি-কীটের কিলিবিলিতে যে দেহ হইবে আচ্ছন্ন; তোমারও কি সেই দেহের কিছু অংশ গ্রহণের ইচ্ছা আছে না কি ! এমন একটা ঘৃণিত মেথর পাড়ার প্রতি তোমার এ হেন আকর্ষণ দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য হইতে হয়। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন।

অস্থিস্থূনং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং
চর্মাবরণতুর্গন্ধপূর্ণং মূত্রপুরিষয়োঃ।
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরং
রজঃস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ ॥

দেখিলে তো, কবির চোখে আর সৌন্দর্যের দৃষ্টি নাই। কবি দেখিতেছেন এক অস্থির কাঠামো স্নায়ুর বাঁধনে বাঁধা, মাংস ও শোণিতে পরিলিপ্ত দুর্গন্ধযুক্ত মূত্র পুরীষের আধার গুলি চর্মের আবরণে আবৃত। জরা শোকে সমাবিষ্ট রোগ ও পঙ্গুত্বের আশ্রয়স্থল, পঞ্চভূতের গড়া রজস্বলা যুক্ত এই অনিত্য দেহকে তুমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ কর।

একটু ভাবিয়া দেখ !

যদন্তরস্য দেহস্য বহিঃস্যাচ্চেত্তদেব হি।
দণ্ডগ্রহাবারয়েয়ুঃ শুনঃকাকাশ্চ মানবাঃ ॥

ঐ দেহের অন্তরালে যা লোকান আছে, তা যদি একবার বাহির হইয়া আসে, তবে লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়াও লোভাতুর কাক, কুকুরের গতিরোধ হয়ত সম্ভব হইবে না। এহেন

দেহের চরম পরিণাম

দেহের প্রতি অন্ধ কেবল তুমিই নও, কত কত অর্বাচীনের দলই না আত্মাহুতি দিতেছে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় আগত-পক্ষ পিপীলিকার মত।

হে কিশোর ! সংযত হও। ভাবিয়া দেখ এরা কারা।

সন্ত কবীর বলিয়াছেন ঃ—

দিন কী মোহিনী রাত কী বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাবরা হো কর ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

দর্শনাৎ হরতি চিত্তং স্পর্শনাৎ হরতি বলম্ ।
সম্ভোগাৎ হরতি সর্বং নারী প্রত্যক্ষ নাগিনী ॥

(কোন ব্রহ্মচর্যকামী ভগিনী এই অংশটুকু পুরুষ শরীরের প্রতি অর্থারোপ করিয়া লইয়া পড়িবেন)

সাবধান কিশোর ! যুবতীর কুটিল কটাক্ষের হাত হইতে আজ পর্যন্ত কেউ রক্ষা পায় নাই। একবার যদি চোখে চোখ পড়ে, তবে তোমার মত ক্ষীণজীবীর তো কা কথা ; আজন্ম ব্রহ্মচারী ঋষি-মহর্ষিদেরও জীবন রক্ষা পায় নাই। একবার যদি তাকে ভুলে চুকে স্পর্শ করিয়াছ, তোমার দৈহিক, চারিত্রিক, মানসিক, সর্ববিধ শক্তির বাঁধন এক মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তুমি সন্মোহিতের মত তার ইসারায় নিজের গলায় নিজেই ফাঁসির দড়ি পরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। আর যদি একবার সে তোমাকে কুক্ষিগত করিতে পারে, রে মূর্খ তোমার সমস্ত শক্তি চুষিয়া নিয়া চর্বিত ইক্ষুখণ্ডের মত তোমার এই নিরস সর্বস্বান্ত দেহটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিবে।

এই নাগিনীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় দৃষ্টি সংযম। রূপ এক মোহের ফাঁদ, তুমি সর্বোতোভাবে আত্মসংযত করিয়া জীবন রক্ষা কর।

শ্রবণ

আহারের তৃতীয় পন্থা শ্রবণ। শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রতি-নিয়ত আহরণ করিয়া চলিয়াছে শুভ অশুভ বহুবিধ শব্দ চিত্র। যে কোন শব্দেরই প্রতিক্রিয়া মনের পটে রেখা-পাত না করিয়া যায় না। এই শব্দের দুটি রূপ, একটি বাচিক আর একটি আক্ষরিক। তুমি যদি মনে প্রাণে সংযম সাধনার ইচ্ছা কর তবে তোমার ঐ শ্রবণ প্রসঙ্গ হইতে হইবে পবিত্র থেকে পবিত্রতম। যেমন সঙ্গ তেমনই প্রসঙ্গ। ঐ প্রসঙ্গ যদি তোমার মনের সুপ্ত কামনাকে উদ্বুদ্ধ করে, যদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে করে উত্তেজিত, তবে অসীম মনোবলের সঙ্গে সেই সঙ্গ ও প্রসঙ্গ থেকে তোমাকে দূরে থাকিতে হইবে।

কেবল যে শৃঙ্গার রসাত্মক নারী সৌন্দর্যের অলঙ্কার শোভিত সাহিত্যই মনকে বিক্ষুব্ধ করে তা নয় ; সিনেমার হাল্কা ধরণের সঙ্গীতও তোমার মনকে স্থির থাকিতে দিবে না। যদি তোমার বন্ধু-পরিবেশটি সুন্দর সবল না হয়, যদি বয়ে যাওয়া বকাটে ছেলের দলে পড়িয়া গিয়া থাক,

তবে তোমার সরল মনকে এ সকল কলুষিত প্রসঙ্গ বিচলিত করিবেই করিবে। সুতরাং হে ব্রহ্মচর্যকামী কিশোর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও। যত ভালই হউক যত, প্রশংসিতই হউক না কেন ; আদি রসাত্মক নাটক, নভেল, সিনেমা বা রেডিও সঙ্গীত সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। শ্রবণের মধ্যে আর একটি কথা অত্যন্ত গুরুতর, সেটি হইল নারী কণ্ঠের মধুর সম্ভাষণ ও সংলাপ। তুমি হয়ত চাও না, কিন্তু পরিবারের পরিবেশে সামাজিক ব্যবহারে এমনতর প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন পরিচিত অপরিচিত কোন কোন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না করিলে চলেনা। হে কিশোর! জিজ্ঞাসা কর তোমার হৃদয়কে, যদি তা সর্বতোভাবে নিষ্কলুষ হয়, তবে আর বলার কিছুই নাই ; কিন্তু যদি কিছুমাত্র আকর্ষণের অনুভবও তোমার হইয়া থাকে, তবে বাগ্‌বিলাসের দিকে আর আগাইও না। প্রথম সম্ভাষণ, তার পর আরম্ভ হইবে ভাষণ। কারণে অকারণে কথোপকথনের তীব্র ইচ্ছা। তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ত সদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিবে, এই বুঝি ডাক আসিল বা টেলিফোনের ঘন্টি বোধহয় বাজিল। শ্রবণ তোমাকে টানিয়া নিয়া যাইবে নিকটে। দর্শন তোমাকে অভিভূত করিবে রূপে। এ যেন মৃগের ভাগ্যে বধিকবেনু। শ্যামল

ঝাড় ঝোপের অন্তরালে বসিয়া ব্যাধ বেনু বাজায়, অন্তর নিংড়ানো করুণ ক্রন্দনের সুরে ; সেই বেনু শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গো-বেচারা মৃগ ছুটিয়া চলে অন্ধের মত। মৃত্যুর ফাঁদগুলি সে দেখিতে পায় না। পরিণামে বধিকের হাতে পৈত্রিক প্রাণটা খোয়াইয়া বসে।

শুনিতেই যদি হয় তবে আর কলুষ কথা শুনিয়া কি হইবে। এবার গুরুর কথা শুন, তোমার হিতৈষী বন্ধুর কথা শুন। হে কিশোর! তোমারই মত এক কিশোরের কথা জানি। রামায়ণ মহাভারত পড়িতে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু দেখা গিয়েছে, যেখানে যত আদি রসাত্মক প্রসঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া শুধু সেগুলি পড়িয়াই সে মহাভারত পড়ার আনন্দ পাইত। পড়ার মত বইয়ের অভাব নাই। তোমার আদর্শ ও লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে,তবে তদনুযায়ী গ্রন্থের অভাব হয় না। মহাপুরুষগণের জীবন প্রসঙ্গ, দেশ মাতৃকার বেদীমূলে উৎসৃষ্ট প্রাণ বীর সৈনিকগণের জীবন কথা, বৈজ্ঞানিকগণের চিত্ত চমৎকারী নিত্য নূতন আবিষ্কারের ইতিহাস তোমার অধ্যয়ন প্রিয়তার উপাদান যোগাইতে সমর্থ। আজকাল বাজারে তোমাদের মত তরলমতি কিশোর-কুলের সর্বনাশের খোরাক জোগাইয়া নিজেদের আর্থিক উন্নতি সাধনে তৎপর কিছু স্বার্থান্বেষী প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের

হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। তাদের সস্তা দামের হাল্কা সাহিত্যে বাজার আজ জমজমাট। তুমি নিজে যদি তোমার উপযুক্ত অবসর পঠনের নির্বাচনে সমর্থ না হও, তবে তোমার হিতৈষী শিক্ষক, পিতা, মাতা বা কোন আধ্যাত্মিক পুরুষের পরামর্শ নিও। যদি তোমার মস্তিষ্ক অধ্যয়নের উপযুক্ত খোরাক না পায়, তবে বরং খালি থাকুক, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু বিষ ভক্ষণের চেয়েও তীব্র হলাহলে পরিপূর্ণ চিত্তোত্তেজক যৌন সাহিত্যে হাত দিও না।

স্পর্শ

তোমার সংযম সাধনার এ এক মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুখ-স্পর্শে শিহরণ জাগে অন্তরের অন্তস্থলে।

তুমি যদি সংযম সাধনায় ব্রতী হইয়া থাক, তবে হে কিশোর! স্পর্শেন্দ্রিয়ের লোলুপতা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চল। কোমল নারী অঙ্গের কথা তো স্বপ্নেও ভাবিও না। কিন্তু তাতেই লেঠা চুকিল না। ছোট ছোট ভাইবোনেদের কোলে কাকে নিয়া বেড়ান, আদর করিয়া চুমুখাওয়া এও তোমার পক্ষে কম বিপদের কথা নয়। তুমি হয়ত জান না তোমার এই প্রবৃত্তি যৌন বিকারেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং যখন তুমি বালক ছিলে, তখনকার চেষ্টার সঙ্গে এখনকার তুলনা

করিও না। তোমার অবাধ্য মন, অসংযত ইন্দ্রিয় খুবই স্পর্শকাতর। সুতরাং সাধু সাবধান। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা, আধুনিক বিজ্ঞানের দানে অতিশয় কোমল ডানলো পিলোর কুসন বা কোচ তোমার জন্য নয়। এ সব ভোগী বিলাসী বিশেষ গৃহস্থাশ্রমীর ভোগোপাদান। তোমার জীবন হইবে কঠিন। নিজের দেহকে যেমন কঠিন করিয়া তুলিবে তেমনি কষ্টসহিষ্ণু এবং নির্বিলাসও করিয়া তুলিতে হইবে। কম্বলের পাতলা বিছানায় ইট মাথায় দিয়া অথবা ভুজদণ্ডকে উপাধানের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়া তুমি যদি তোমার যৌবনের কটি বছর কাটাইয়া দিতে পার, তুমি মহাপুরুষ। অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তি তুমি পাইবে। স্পর্শেন্দ্রিয়ের আর একটি মুখ্য কথা হইল, শীতোষ্ণের তিতিক্ষা। সংযম সাধনায় সেটি একটি অনিবার্য প্রকরণ। তুমি যদি এখনই সতর্ক না হও, তবে জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলা সম্ভব হইয়া উঠিবে কি ? তোমার চর্মেন্দ্রিয়ের সেবাতেই যদি কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসকল সীমাবদ্ধ রহিল তবে চর্ম-মীমাংসক চামারে আর তোমাতে পার্থক্যই বা কি। চর্মের কৃষ্ণত্ব বা গৌরত্বকে নিয়া গরিমা করিও না। যা নিতান্তই নিকৃষ্ট উপাদানে গঠিত, যার পরিণাম শেষ পর্যন্ত একমুষ্টি চিতাভস্ম, সেই চর্মের বড়াই করিয়া চতুর

সাজিতে যাইও না। অসংখ্য ছিদ্রপথে প্রস্বেদের যে প্রবাহ বহিয়া আসে তাহাতে তোমার চর্মেন্দ্রিয়ের আকর্ষণীয়তা প্রমাণিত হয় না। যতপ্রকার সুগন্ধিদ্রব্য বা পাউডারের প্রলেপই লাগাওনা কেন, সেই কুৎসিৎ স্বেদগন্ধ কোন কালেই প্রতিহত হয় নাই বা হইবে না। হে কিশোর! চর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আবার মুখমণ্ডলটুকুর উপরেই মমত্ব ও আকর্ষণ সর্বাধিক। তোমার অসংযমের কলঙ্ক যখন ঐ মুখচর্ম ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তুমি বাহ্য প্রলেপের দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে কত চেষ্টাই না কর, কিন্তু ফল কিছুই হয় না। যদি তোমার চর্ম সৌন্দর্যের উৎকর্ষই কামনা হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মচর্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ভিন্ন তাহাতে সফল হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। মোটকথা তোমার স্বীয় স্পর্শেন্দ্রিয়ের সৌষ্ঠবের সংরক্ষণেও তোমাকে স্পর্শলোলুপতা পরিহার করিতেই হইবে।

হে কিশোর! স্পর্শ সম্বেদন যে শুধু কোমলাঙ্গ শিশু বা তরুণ, তরুণীর সাহচর্যেই বিক্ষুব্ধ হয়, তাহা নহে। নিজের অসাবধানতায়ও তোমার স্পর্শেন্দ্রিয় উত্তেজিত হইতে পারে। সুতরাং অপ্রয়োজনে কখনও মূত্রেন্দ্রিয়াদিকে স্পর্শ করিতে নাই। সংযম-সাধনায় ব্রতী সকল সাধকের পক্ষে এই একটিমাত্র কারণেই কৌপীন ধারণ একান্ত অনিবার্য। তুই

3

জোড়া কৌপীন আবশ্যক। চব্বিশ ঘণ্টাই কৌপীন পরিধান করিতে হয়। স্নানের সময়ে একটি ভিজাইবে এবং অন্যটি পরিধান করিবে। কৌপীনের দুইটি অংশ। একটি ডোর, একটি কৌপীন। ডোর কটিদেশে কষিয়া বাঁধিতে হয় এবং কৌপীনের দ্বারা মূত্রেন্দ্রিয়কে অধোমুখী করিয়া কষিয়া লইতে হয়। রাত্রিতে শয়নের সময়ে তোমাদের পক্ষে কৌপীন ধারণ অনিবার্য। যাহারা বলেন এই কৌপীন ধারণ ক্লীবত্ব আনিয়া দেয়, তাহারা ভ্রান্ত। ক্লীবত্ব বা ধ্বজভঙ্গাদিরোগের কারণ অসংযম। সুতরাং কৌপীন পরিধান বিষয়ে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই। শয়ন বিষয়েও তোমাকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হইবে। সংযম-সাধকের শয্যা হইবে কঠিন, সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জিত। শয়নের পূর্বে নিদ্রা না আসা পর্যন্ত ভগবন্নাম স্মরণ করিতে থাকিবে। তাহাতে দুঃস্বপ্ন হইবে না। রাত্রির আহার গুরুতর হইলেই স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে। যদি তোমার উবু হইয়া শয়নের কুঅভ্যাস থাকিয়া থাকে, তবে অদ্য হইতে সর্বতোভাবে তাহা পরিহার কর। এই অভ্যাসটি ব্রহ্মচর্যকামীর পক্ষে এক মারাত্মক সমস্যা। রাত্রির আহারের পর কিছুক্ষণ হাটা চলা করিতে হয়।

রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টার পরে আর জাগিতে নাই।

এই দিকটায় যেমন তাড়াতাড়ি শুইবে, ভোরের দিকে তাড়াতাড়ি উঠিবার অভ্যাস করিবে। তোমাদের পক্ষে পাঁচ, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে যাহারা নাক ডাকিয়া ঘুমায় তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা স্বপ্নকল্পনা মাত্র। যত রকমের অনভিপ্রেত ও অনাসৃষ্টি স্বপ্ন ঠিক ঐ সময়টিতেই আসে। আজই প্রতিজ্ঞা কর, একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কোন মতেই আর বিছানায় থাকিবে না। বিছানায় থাকিলেই হয়ত আলস্য আসিবে। আবার হয়ত বিছানায় গা এলাইয়া দিবে এবং তখনই তোমার জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে, অসাবধানে স্বপ্নদোষ ঘটিয়া তোমার সর্বনাশ হইবে।

হে কিশোর! প্রাণান্তেও অন্য কাহারও সঙ্গে শুইবে না। ভাই-বোনেদের তো দূরের কথা, মা-বাবার সঙ্গেও এক বিছানায় শুইবে না। যদি এই নিয়মের প্রতিপালন না কর, তবে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিবে। মনে কর দূর দূরান্তরে কোন সহরে বা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছ, আলাদা বিছানার ব্যবস্থা নাই, তোমাকে অন্য কাহারও সঙ্গে শুইতেই হইবে। সেই রাত্রিটি বরং জাগিয়া কাটাইও, কিন্তু কিছুতেই কাহারও সঙ্গে শুইতে সম্মত হইও না। স্পর্শ সংযমের প্রসঙ্গে বেশভূষার প্রশ্নও

স্বভাবতঃ আসিয়া যায়। তোমার জীবন এখন আর ভোগীর জীবন নয়। তোমার সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবের দেখা দেখি অধুনা প্রচলিত অসংযত পোষাক পরিচ্ছদ কোন মতেই ব্যবহার করিও না। একদিকে সেগুলি যেমন স্পর্শেন্দ্রিয়ে সুঁড়সুড়ি জাগায় অপর দিকে তেমনি তোমার বিলাস-প্রবণতাকে প্রবুদ্ধ করে। সর্বদাই ফিটফাট বাবুটি সাজিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তোমার সাজ পোষাক যদি কোন কিশোরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সে যদি তোমার অজ্ঞাতে প্রতিনিয়তই তোমার কথা চিন্তা করিতে থাকে, তবে মনে রাখিও মনের সেই অদৃশ্য টান তোমাকে পদস্খলিত না করিয়া ছাড়িবে না। ঐ রূপের আকর্ষণ, দৃষ্টির টানাটানি শেষ পর্যন্ত তোমাকে নরকের পথে লইয়া যাইবে। তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ হইবে নির্বিলাস। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। কিন্তু পোষাকের মধ্যে সরলতা এবং পবিত্রতার ছাপ যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

গন্ধ

হে কিশোর! বিলাসিতার আর এক অঙ্গ হইল গন্ধ সামগ্রীর ব্যবহার। ঠাকুর ঘরের পূজা-অর্চনায় অগুরু, চন্দন বা ধূপ-ধূনার সুগন্ধ মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু এমন সব আতর এসেন্স বা স্নো-পাউডার ইত্যাদি সুগন্ধ

দ্রব্য আজকাল প্রসাধন সামগ্রীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে যে, তাহা কোনমতেই মনকে সংযত রাখিতে সাহায্য করে না। এগুলি জীবনের নিতান্তই নিষ্প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তোমাদের মত আদর্শবাদী যুবকের জন্য এসব বিলাস নয়। যদি মনে কর "অন্য সবদিক দিয়াই তো সংযম পালন করিতেছি। এক আধটা বিষয়ে একটু আধটু ছুটছাট থাকিলে কিই বা যায় আসে।" সর্বনাশ, একথা যেন ভুলেও মনে স্থান না পায়। বাঘের ভয়ে ঘরের আটটা দরজাই বন্ধ করিলে, কিন্তু নবমটির বেলায় মনে করিলে "আটটাই তো বন্ধ করিয়াছি এই একটা দরজা খোলা থাকিলে এমন কি আর যায় আসে" পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? এই সকল বিষয়ে কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখিতে নাই।

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ, মীনাঃ হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে, যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

শ্রবণেন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া হরিণ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া মদমত্ত মাতঙ্গ, রূপের অগ্নিশিখায় পতঙ্গ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দাসত্বে ভৃঙ্গ (ভ্রমর), রসনার রঞ্জন মানসে মীন অকালে প্রাণ হারাইতেছে, অথচ হে কিশোর! তোমার পতনের সব কয়টি পথই খোলা। সুতরাং সাবধান হও। এক একটি

মাত্র ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কাহারও জীবন বাঁচিতেছে না। সকল ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিয়া তোমার বাঁচিবার উপায় কি ?

ইন্দ্রিয় সংযমের তাৎপর্য

হে কিশোর ! সংযম-সাধকের জন্য ইন্দ্রিয়ের বিনাশের আদেশ নাই। সংযমকে সংহার বলিয়া ভুল করিও না। চক্ষু তোমাকে রূপের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহাতে হয়ত তুমি মর্মান্তিক যন্ত্রণাই অনুভব করিতেছ। কবি কালিদাসের ভাষায় যদি বলি—

গন্ধশ্চাস্যা ভুবনবিদিতঃ কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা চপলমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈ লূ্র্ণপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তোদ্বিরেফঃ ॥

সুবর্ণবর্ণা কেতকীর সুগন্ধ ভুবন বিদিত। পদ্ম-ভ্রমে রূপে মুগ্ধ হইয়া চপল ভ্রমর সেই কেতকীর মধ্যে গিয়া পড়িল। আর কেতকীর রজঃকণায় হইল দৃষ্টিহীন ; কেতকীর কোপন কণ্টকে তার পক্ষদ্বয় ছিন্নভিন্ন। হে সখে। এখন সে এই যন্ত্রণার মধ্যে থাকিতেও পারিতেছে না, পলাইতেও পারিতেছে না।

তোমার অবস্থায়ও যদি সেইরূপ মুগ্ধ ভ্রমরের মত হয় তবে হয়ত তুমি বিল্বমঙ্গলের মত তোমার নয়নদ্বয় উৎ-

পাটনের কথা চিন্তা করিতে থাকিবে। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংহারের মধ্যে কোন পৌরুষ নাই। কাপুরুষের কর্ম করিয়া চক্ষু না হয় উৎপাটন করিয়াই ফেলিলে। কিন্তু তাহাতেই কি তোমার সমস্যার সমাধান ঘটিবে? স্বপ্নাবস্থায় যে সকল আপাত রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া তোমার ব্রহ্মচর্য খণ্ডিত হয়, নেত্র উৎপাটনে কি সেই দৃশ্য দেখা বন্ধ হইবে? তাহা যখন হইবার নহে, তখন সংহারের পথ বাইবেলে উপদিষ্ট হইলেও সাধক জীবনে তাহা গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং একদিকে রিপু ও ইন্দ্রিয়ের তাড়না আর একদিকে তোমার কঠোর ব্রহ্মচর্যের সাধনার দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে। প্রথম প্রথম বিফলতা আসিবেই। ইন্দ্রিয়নিচয়ের সঙ্গে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদির সম্পর্ক নূতন নয়। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে নানারূপে নানাভাবে তাহাদের এই সম্পর্ক চির অটুট রহিয়াছে। আজই এইমাত্র প্রথম তাহাদের এই স্বচ্ছন্দ বিহারের মধ্যে তুমি মর্যাদার অঙ্কুশ স্থাপনে সচেষ্ট হইতেছ। সুতরাং এক কথায় মন তাহা মানিয়া লইবে কেন? তুমি যতই সাধনায় দৃঢ়তা অবলম্বন করিবে, তোমার মন এবং ইন্দ্রিয় হয়ত ততই আরও বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিবে। প্রবাহমান খরস্রোতা নদী যদি তার গতিপথে প্রচণ্ড প্রস্তর পুঞ্জের প্রতিঘাত পায়, তবে যেই ভাবে প্রচণ্ড বেগে উচ্ছ্বলিত হইয়া

তাহাকে ডিঙ্গাইয়া যায়, তোমার রিপু ও ইন্দ্রিয়গণ প্রথম প্রথম হয়ত তেমনিভাবে তীব্রতম বিদ্রোহ করিবে। তোমার প্রচেষ্টা যদি দৃঢ় হয়, যদি তুমি একনিষ্ঠ হও তবে কিছুদিনের মধ্যেই দেখিতে পাইবে সব কিছু ধীরে ধীরে বশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে সাধক! ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি নিরর্থক নহে। তুমি ভগবদ্ শরণাগত হও এবং যমলার্জুনের মত প্রার্থনা কর!—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে
দৃষ্টি সতাং দর্শণেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

হে প্রভো! আমাদের বাণী যেন আপনারই মঙ্গলময় গুণকীর্তনে তৎপর থাকে। আমাদের কর্ণযুগল যেন আপনার রসাপ্লুত কথাশ্রবণে বিভোর থাকে। আমাদের হস্তদ্বয় আপনার সেবায় এবং মন আপনারই চরণ চিন্তনে নিমগ্ন থাকে। এই সমগ্র জগত চরাচর আপনারই নিবাস স্থান জানিয়া আমাদের মস্তক যেন সকলের সমক্ষে প্রণত থাকে। সাধু, সন্ত এবং সন্ন্যাসী আপনারই প্রত্যক্ষ শরীর। সুতরাং আমাদের নয়নযুগল যেন তাহাদের দর্শনে সদা সংলগ্ন থাকে।

তুমি তোমার ঐ ইন্দ্রিয়গণকে যদি স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পার, তবে আজ যেমন তাহারা তোমার অধঃপতনের পথিকৃৎ, তেমনি তখন হইবে ভগবদ্ কৃপা লাভের সহচর। গীতায় ভগবান একটি পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন।

যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ।

ভীত শঙ্কিত কচ্ছপ যে ভাবে তার ইন্দ্রিয়গুলিকে শরীরের ভিতরে গুটাইয়া লয়, যখন বিষয়ের আকর্ষণে ইন্দ্রিয়গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠে তখন তুমিও তেমনি ভাবে অন্তর্মুখ করিয়া লইও। আবার যখন ভয় দূরীভূত হইবে তখন ভগবদ্ গুণানুবাদ শ্রবণে, পবিত্র রূপের দর্শনে, সেবায় ও সৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়গ্রামের যথাযথ উপযোগ করিও।

মনোজয়

হে কিশোর! ইন্দ্রিয়গণের স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই।

মনোহি জগতাং কর্তা মনোহি পুরুষ স্মৃতঃ।
মনকৃতং কৃতং রাম ন শরীরকৃতং কৃতম্ ।।

(যোগবাশিষ্ঠ)

যোগবাশিষ্ঠে শ্রীরামের প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন ঃ—হে রাম! মনই জগতের কর্তা। মনই পুরুষ বলিয়া কথিত। মনের দ্বারা কৃতকর্মই কর্ম। মনের সাহচর্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অজ্ঞাতসারে

যদি কোন কর্ম ঘটিয়া যায় তবে তাহাতে পাপ বা পুণ্য কিছুই হয় না। সুতরাং সংযম-সাধনায় মনসংযমের কথাই মহত্ত্বপূর্ণ। পূর্ব কথিত রূপ-রসাদি বিষয়ের দিকে মনেরই হয় আনাগোনা। বিচারের মাধ্যমে মনে যদি একবার বিষয় বিতৃষ্ণা আসে তবেই ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা বা ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভব। ভোগের দ্বারা ভোগেচ্ছার পরিসমাপ্তি 'কোনদিনই ঘটে নাই, ঘটিবেও না।

ন জাতু কাম কামানুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্ধতে॥

কামনার উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় কোনদিনই চরিতার্থ হয় না। হোমানলে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা যেমন বাড়িয়াই চলে, কোন কালেই প্রশমিত হয় না, তেমনই বিষয়-ভোগেও ইন্দ্রিয়ের বা মনের পরিতৃপ্তি আসে না। এ যেন দাদের চুলকানি।

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্
কণ্ডুয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডুতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

ভাগবত ৭।৯।৪৫

ভক্তবীর প্রহ্লাদ ভগবান নৃসিংহের স্তুতি করিতে গিয়া বলিলেন ঃ—হে প্রভো ! গৃহস্থাশ্রমিগণের মৈথুনাদিজনিত সুখ অতন্ত তুচ্ছ। যেমন দদ্রুজনিত চুলকানিতে একপ্রকার সুখানুভূতি হয়। আহা আহা উহু উহু করিতে করিতে চুলকানির জ্বালাকে সাময়িক সুখ বলিয়া অনুভূত হয় এবং চুলকানি থামাইলেই যেন আরও অধিকতর চুলকাইতে ইচ্ছা হয় ; এই সাংসারিক মৈথুনাদি সুখও যেন তেমনি। ধীর ব্যাক্তিগণ এমন সুখের আকাঙ্খা করেন না। রাজা যযাতির কথা হয়ত শুনিয়াছ। যৌবনের তীব্র ভোগেচ্ছায় তাহার হৃদয় সন্তপ্ত হইতেছিল, কিন্তু শুক্রাচার্যের অভিসম্পাতে অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত পুত্রের যৌবন ভিক্ষা করিয়াও রিপু ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাতেও যখন পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ—

ভোগা ন ভোক্তা বয়মেব ভোক্তা......
তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণা......

ভোগকে তো ভোগ করা যায়না, বরং ভোগই আমাদিগকে কবলিত করিতেছে। তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয় না, বরং আমরাই জীর্ণ হইয়া চলিয়াছি। এই ক্ষণিক ভোগের

পিছনে যে অপরিমিত দুঃখের পরম্পরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। তবেই সংযম-সাধনায় কৃতকার্যতার আশা।

হে কিশোর! মনের চঞ্চলতা নিয়া কেবল তুমিই যে বিব্রত তাহা নহে। ভোগী, যোগী, সংসারী বা সন্ন্যাসী সকলের জন্যই মন এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন।

বানরস্য সুরাপানং ততো বৃশ্চিকদংশনম্।
তন্মধ্যে ভূতসঞ্চারো যদ্‌বা তদ্‌বা ভবিষ্যতি ॥

বানর স্বভাবতই চঞ্চল জাতি, তাকে যদি মদ্যপান করান হয়, তদুপরি যদি আবার বৃশ্চিক দংশন করে, তবে তার চঞ্চলতার কল্পনা করিয়া দেখ। তদুপরি যদি ভূতে পায় তবে তো আর কথাই কি! মন ততোধিক চঞ্চল। এমন চঞ্চল মনকে বশে না আনিতে পারিলে ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা কেবল কথার কথা মাত্র। ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য সৃষ্টির মূল কারণও মন। মননেই মনের কল্পনা বিলাস; মননের পরে বচনে এবং সর্বশেষে ক্রিয়ায় রূপায়িত হয় সেই কল্পনা। সুতরাং মনকে সর্বপ্রকার কাম কল্পনা হইতে মুক্ত না করা পর্যন্ত কামাহত কুকুরের মত অস্থিরতার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না। সুতরাং অষ্টপ্রকার মৈথুন হইতে সর্বপ্রচেষ্টায় বিরত হইতে হইবে।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্ ।
সঙ্কল্পঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচ ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ ॥

(দক্ষ সংহিতা)

স্মরণ

নারীর রূপ লাবণ্য, সম্ভাষণ, চেষ্টা চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ের মনে মনে স্মরণও মৈথুনের অঙ্গীভূত। এই স্মরণের ফলে মন যখন উত্তেজত হয় শরীরে দেখা দেয় তার বিকৃত প্রতিক্রিয়া। দধি মন্থনের ফলে ঘোল এবং মাখন আলাদা হইয়া গেলে সেই মাখন যেমন আর কোনমতেই ঘোলের সঙ্গে মিলিয়া যায় না, তেমনি মনের উত্তেজনায় ধমনী ধমনীতে সঞ্চারিত রক্তস্রোতে অনুস্যুত শুক্র যখন আলাদা হইয়া যায় তখন আর কোন মতেই তার সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। পুরীষ মূত্রাদির সঙ্গে অথবা মুখমণ্ডলে ব্রণের আকারে কাঁচা পারদের মত তাহা বাহির হইবেই হইবে। সুতরাং হে কিশোর! "মনে মনে মাত্র স্মরণ করিলাম, তাহাতে আর এমন কি দোষ? কোন অঘটিত ক্রিয়া তো করি নাই?" এ হেন স্তোকবাক্যে মনকে ভাওতা দেওয়ার চেষ্টা করিও না।

কীর্ত্তন

মনের কল্পনা যখন বেগবতী হইবে তখনই ঐ কাম প্রসঙ্গের আলোচনায় আনন্দ পাইবে। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিয়া সত্য মিথ্যা অনেক রকমের কাল্পনিক প্রসঙ্গ মশলা পাতির মিশ্রনে উত্তেজক করিয়া বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইবে। ঐ একই উদ্দেশ্যে কুৎসিৎ উপন্যাস এবং গল্পলেখার প্রচেষ্টা। সে যে কি এক ভয়ঙ্কর নেশা, একবার এই রসে যে ডুবিয়াছে সেই মাত্র ভুক্তভোগী। এই নেশার হাত হইতে উদ্ধারের আর কোন পথ থাকে না। সুতরাং বাক্ সংযম প্রকরণে যা বলা হইয়াছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনের চেষ্টা কর।

কেলি

কেলি মানে ক্রীড়া। ভুলেও কখনও মেয়েদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতার আত্মঘাতী প্রচেষ্টা করিও না। সাংসারিক লোকদের মধ্যে দেবর-বৌদিদি অথবা শালিকা-ভগ্নিপতি, অথবা বেয়াই-বেয়ানদের সম্পর্কটা কিছু হাল্কা ধরণের বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা আকারে ইঙ্গিতে অনেক প্রকার রঙ্গ রসিকতায় ঢলিয়াও পড়েন। কিন্তু হে কিশোর! তুমি যদি সত্যই জীবন গঠনে ব্রতী হইয়া থাক, তবে বৌদিদিকে জননীর মত ভক্তি, শ্রদ্ধা পূর্বক প্রত্যহ প্রণাম করিও। মর্যাদার গণ্ডী থাকিলে রসিকতা স্থান পাইবে না। সীতা

ও লক্ষ্মণ চৌদ্দটি বৎসর পাশাপাশি ছিলেন। কিন্তু কখনও এমন অনভিপ্রেত প্রসঙ্গের কল্পনাও কেহ করে নাই। এমন সম্পর্কিত অন্য কোন রমণী যদি উপযাচক হইয়া আলাপ করিতে আসে, তবে উত্তর প্রদানের উপযুক্ত প্রশ্ন হইলে ভূলগ্ন নয়নে মর্যাদিত ভাষায় অতি সংক্ষেপে উত্তরটুকু দিয়া সরিয়া পড়িবে। ইহাই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। সর্বদা সতর্ক থাকিও কখনও যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হইয়া যায়।

প্রেক্ষণ

দৃষ্টি সংযম প্রকরণে এবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি ; সুতরাং এখানে আর গ্রন্থ বিস্তার বাহুল্য মনে করি।

গুহ্যভাষণ

হে কিশোর! একবার ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মাতা কুন্তি চির যুবতী, আর মাদ্রী অনিন্দ্য সুন্দরী, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমার মন কি বিকারমুক্ত থাকে রাজন?" ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির নিষ্ক তাহার হৃদয় দুর্বল্যের কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেনঃ— "সেইজন্যই কোনদিন আমি ভুলেও একাকী মাতৃদর্শনে যাই না" অনুভূত নগ্ন সত্যের ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরই যদি এহেন অবস্থা—তোমার মত সমস্যা সঙ্কুল যুবকের গুহ্য সম্ভাষণে কি অবস্থা হইতে পারে ;

গুরুত্বের সঙ্গে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? অধিক তো কি বলিব, যদি তোমার আপন সহোদরাও হয় তথাপি একাকী ঘরে এক পলকের জন্যও থাকিবে না। কথাবার্তা তো দূরের কথা। সময় সুযোগ অনুকূল হইলে অনেক জ্ঞানী, গুণী পণ্ডিতেরও বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে এমন কোন প্রসঙ্গই আসিতে না পারে, পূর্ব হইতেই তাহার জন্য সতর্কতার অনতিক্রম্য প্রাচীর নির্মাণ প্রয়োজন।

সঙ্কল্প

সঙ্কল্প বলিতে এইখানে কাম সঙ্কল্পকে বুঝিতে হইবে। স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ এবং গুহ্যভাষণের পরে সঙ্কল্পের কথাটি বলার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য আছে। এতগুলি সিঁড়ি গড়াইয়া আসিবার পর একটি বলের পক্ষে মধ্যপথে দাঁড়ান বড়ই দুষ্কর ব্যাপার। সুতরাং প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হইবে। যদি সঙ্কল্পের পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়া থাক, তবে মনোবলের সঞ্চারের জন্য কোন সৎপুরুষের শরণাগত হও। সঙ্কল্পই মনের স্বরূপ, তখন শুভ সঙ্কল্পের দ্বারা ঐ কাম সঙ্কল্পকে দূর করিতে হইবে।

হস্তং হস্তেন সম্পীড্য দন্তৈ দন্তাংশ্চ পীড়নম্।
অঙ্গান্যঙ্গৈ সমাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনম্॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

নিজের হাতে করমর্দন করিয়া, 'দাঁতে দাঁত পিসিয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পীড়নের দ্বারা মনের উপর ক্রোধযুক্ত হইয়া বিজয় লাভ করিতে হইবে। মনে রাখিও কাঁটা ছাড়া কাঁটা খোলা যায় না। পারিব না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না।

চিত্তমেকং ন শক্নোতি জেতুং স্বাতন্ত্র্য বর্জিতঃ।
ধ্যানবার্তা বদন্মূঢ়ঃ স কিং লোকে ন লজ্জতে॥
এক এব মনোদেব জ্ঞেয়ঃ সর্বার্থ সিদ্ধিদঃ।
অন্যত্র বিফল ক্লেশঃ সর্বেষাং তজ্জয়ং বিনা॥ যোঃ বাঃ

"যে ব্যক্তি একমাত্র চিত্তকে জয় করিতেই সমর্থ নয়, সেই পরাধীন মূঢ় ব্যক্তির জপ-ধ্যান বা জ্ঞান-ভক্তির কথা বলিতে কি লজ্জা হয় না? মনের দুইটি দিক, শুভ এবং অশুভ। মনকেই দেবতা বলিয়া জানিবে। মনই তোমার সর্বসিদ্ধি প্রদাতা। সুতরাং তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার ভিন্ন অন্য-প্রকারের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ জাগ্রত হইবে বারংবারই তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হইবে বিচারের সুশাণিত খড়গাঘাতে। উপায়ান্তর না দেখিলে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া পড়িও এবং প্রাণবায়ু অবরোধ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য কুম্ভক করিও। ইহাতে বিশেষ ফলোদয় হইবে। আরও একটি সহজ

উপায়ের কথা বলি। সেইটি হইল সিদ্ধাসনে উপবেশন। বাম পায়ের গোঁড়ালীটিকে গুহ্যদ্বার এবং জননেন্দ্রিয়ের মাঝখানে খুব চাপিয়া ধরিবে এবং ডান পায়ের গোড়ালীদ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়ের উপরিভাগকে চাপিয়া বসিবে। ইহারই নাম সিদ্ধাসন। তৃতীয় উপায় হইল মৃত্যু চিন্তা। তোমার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কাহারও না কাহারও অকাল মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবে তুমি। মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার কাহারও নাই।

"অন্তঃ বন্ত ইমে দেহা।" অথচ মৃত্যুর অবধারিত সময় আমরা কেহই অবহিত নই।

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতম্।
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভি কালো ন বিজ্ঞায়তে ॥
(ভর্তৃহরি)

দিবাকরের যাতায়াতে প্রতিদিন জীবনের পরিধি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু বিষয় মোহে বিমুগ্ধ প্রাণী কালের প্রসারিত বদন জানিতে পারিতেছে না? তাহাদের অবস্থা কেমন?

যথা ব্যালগলস্থোহি ভেকঃ দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহীনাগ্রস্তঃ লোকো ভোগানশাশ্বতান্ ॥

সর্পের কবলে কবলিত ভেক নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলিয়া গিয়া মুখের কাছে আসিয়া পড়া মশা, মাছি যেমন ধরিয়া খায়, তেমনি কালের গালে চর্বিত এই জীব জগত বিষয় ভোগে উন্মত্ত হইতেছে। হে কিশোর! তুমি কালের কথা ভাব। কামের পাঞ্জা ছুটিয়া যাইবে। দেহের অন্তিম পরিণতি একমুষ্টি ভস্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। রাজার সুকোমল দেহ চন্দনের চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে, আর তাহারই পাশে আম কাষ্ঠে দগ্ধীভূত হইয়াছে এক চিরদরিদ্রের অস্থি পঞ্জর। ঐ দুই চিতা হইতে দুই মুষ্টি ভস্ম লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহার মধ্যে তিল মাত্রও পার্থক্য নাই। মৃত্যুর সময়ের বিভীষিকা, রোগ যন্ত্রণার কথা স্মরণ কর। মন কামের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া তোমার বশে আসিবে। জোঁক দেখিয়াছ? শরীরের কোন অঙ্গে একবার লাগিয়া গেলে রক্ত চুষিতে চুষিতে পিণ্ডাকৃতি হইয়া উঠে। ছাড়াইলেও ছুটিতে চাহে না। অযথা টানাটানি না করিয়া দুই চার বিন্দু চূনের জল বা হুকার জল তাহার মুখে ঢালিয়া দিলে এক মুহূর্তেই ছাড়িয়া দেয়। কেবল ছাড়িয়াই দেয় না, যত রক্ত চুষিয়াছিল নিঃশেষে বমন করিয়া ফেলে। মনের অবস্থাও তদ্রূপ। কামের চিন্তনে মশগুল মন

সেই চিন্তা কিছুতেই পরিহার করিতে চায় না। কিন্তু কোন মতে একবার যদি মনকে অবধারিত মৃত্যুর পরোয়ানাটি পড়াইয়া দিতে পার, তবে সকল কাম-সঙ্কল্পই সে পরিত্যাগ করিবে।

অধ্যবসায়

অধ্যবসায়ের অর্থ বারংবার প্রচেষ্টা। আধ্যাত্ম বিষয়ে বা ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিষয়ে এই অধ্যবসায় যেমন একান্ত সহায়ক, তেমনি পতনের প্রচেষ্টায় অত্যন্তই ভয়াবহ। সুতরাং নিজের ভুল একবার বুঝিতে পারিলে ঐ বিষয়ে পুনর্বার অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। এই কুপ্রচেষ্টা-গুলির মধ্যে ছোট ছোট বালকদের সঙ্গে অযথা কোলাকোলি ঘেঁাসাঘেঁাসিও আসিয়া পড়িতেছে। অনেক প্রকার কুঅভ্যাসের দাস হইয়া স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য খণ্ডনের প্রচেষ্টায় অনেক প্রকার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কুৎসিত আচরণ করিতে থাকে। সেই কুঅভ্যাস হইতে আত্মরক্ষা বড়ই কঠিন ব্যাপার। চেষ্টা যত্ন সহকারে মনের মোড় ঘুরাইতেই হইবে।

ক্রিয়া নিবৃত্তি:—

অষ্ট প্রকার মৈথুনের এইটিই প্রত্যক্ষ ক্রিয়া। সর্ব প্রচেষ্টায় তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিবে।

সংযম-সাধনার সহচর

সৎসঙ্গ ঃ—

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গী সুখমশ্নুতে।
তেন সঙ্গঃ পরিত্যজ্যঃ সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥

বন্ধনের একমাত্র কারণই হইল সঙ্গ। বাংলা কথায় প্রবাদ আছে—সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

যেমন সঙ্গ তেমনই রঙ্গ। সঙ্গ যদি ভাল না হয় তবে পূর্ব কথিত সংযম-সাধনার সকল বাঁধই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সাধককে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিঃসঙ্গী হইতে হয়। কিন্তু প্রথমাবস্থাতেই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং জীবন গঠনের পথে সদ্‌গুরুর সাহায্য সহানুভূতির একান্ত প্রয়োজন। কুসঙ্গীর কুপরামর্শে, সাহচর্যে এবং তার অনুকরণে যাহাদের জীবন ধ্বংসোন্মুখ তাহারা যদিও সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু দুষ্পরিণাম বুঝিতে কিছুই কষ্ট হয় না।

একটু সাহায্য সহানুভূতি পাইলে জীবনরক্ষার জন্য তাহারা ডুবন্ত মানুষের মতই প্রচেষ্টা করে। হে কিশোর! তোমাকে এমন একজন সৎপুরুষের স্মরণ লইতে হইবে, তোমার নিজের জীবনের বাগডোর যাঁহার হাতে সঁপিয়া দিতে পার পরম নিশ্চিন্তে। তিনি তোমাকে শক্তি জোগাইবেন।

তোমার দুর্বল মুহূর্তগুলিতে সতর্ক করিয়া দিয়া জীবন রক্ষা করিবেন। আদেশে, অনুশাসনে তোমার জীবনকে এক শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়া সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। যিনি নিজে সংযম-সাধনার সাধক, তাঁহার কাছ হইতেই এমন সাহায্য সহানুভূতি লাভ করা সম্ভব। তাহার জীবনাদর্শের অনুকরণ মাত্রই তোমার জীবন আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। যেমন দুর্গ রচনা ভিন্ন যুদ্ধে জয় লাভ সম্ভব হইয়া উঠে না, তেমনি কোন মহাপুরুষের আশ্রয় ভিন্ন রিপু ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংগ্রামে আঁটিয়া উঠা দুষ্কর ব্যাপার।

উপাসনা ঃ--

হে কিশোর! ভোগমুখী চিত্তকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে এক পবিত্র আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, যাকে অবলম্বন করিয়া মন স্থির থাকিবে। ভগবদ্ভক্তি ভিন্ন এমন নিরাপদ আশ্রয় আর নাই। তুমি যদি সত্যই সংযম-সাধনায় ব্রতী হইয়া থাক, তবে কেবল মহাপুরুষের কাছে আসা যাওয়াতেই কাজ চলিবে না। যাঁহার রাতুল চরণে আশ্রয় লইয়া তিনি পরম শান্তির অধিকারী হইয়াছেন, তোমাকেও সেই অভয় চরণেরই আশ্রয় লইতে হইবে। তুমি

এখনও কিশোর। হয়ত অধ্যয়নই তোমার জীবনের একমাত্র সাধনা। কিন্তু ভগবানকে বাদ দিয়া কোন জীবনই সর্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের প্রাক্কালে একাগ্রমনে ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা আরম্ভ করিও। একটি কুসুমকলি ভগবচ্চরণে নিবেদিত হইলে প্রসাদীফুল বলিয়া সম্মানিত হয়। যেখানে সেখানে পড়িয়া, কাহারও পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যেমন তাহা বিনষ্ট হয় না, তেমনি তোমার মন কুসুমটিও যদি এমনই ভাবে নিবেদন করিতে অভ্যস্ত হও তবে আর কুৎসিত ভোগপঙ্কে আর নিমজ্জিত হইবে না। সর্বদা মনে রাখিও অমিতবীর্যের অধিকারী ব্রহ্মচর্যের মূর্ত প্রতীক ভগবান বজ্রাঙ্গী (হনুমান) ভগবান শ্রীরামের কিঙ্কর ছিলেন। রামকৃপা ভিন্ন কঠোর ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা কোন কালেই সম্ভব হয় না। তোমার অধ্যয়ন কক্ষে কীর্তন-রত হনুমানের একটি দিব্য প্রতিকৃতি রাখিও। প্রাতঃ স্নানের অভ্যাস করা ভাল। তাতে শরীর শীতল থাকে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হয়। তার পরেই কিছুক্ষণ একান্ত মনে তোমার মনভিলষিত ভগবানের শ্রীমূর্তি ধ্যান করিও। প্রত্যহ উপাসনান্তে—ভগবানের কাছে অমোঘশক্তি লাভের জন্য এই বৈদিক প্রার্থনাটি অবশ্য পাঠ করিও—

ওঁ বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
ওঁ বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওঁ তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
ওঁ ওজোঽসি ওজোময়ি ধেহি।
ওঁ মন্যুরসি মন্যুংময়ি ধেহি।
ওঁ সহোঽসি সহময়ি ধেহি!

হে বীর্যস্বরূপ প্রভু! আমায় অখণ্ড, অমোঘ বীর্য প্রদান করুন।

হে বলস্বরূপ পরমাত্মা! আমায় দৈহিক মানসিক এবং আত্মিক শক্তি প্রদান করুন।

হে তেজঃস্বরূপ পরমাত্মা! আমায় অমিত তেজস্বী করিয়া তুলুন।

হে সাত্ত্বিক ক্রোধস্বরূপ পরমাত্মা! মনের ভোগবৃত্তির প্রতি কষাঘাত হানিবার জন্য আমাকে সাত্ত্বিক ক্রোধ প্রদান করুন।

হে সংগঠনরূপ পরমাত্মা! আমাদিগকে সংগঠন শক্তি প্রদান করুন। এই প্রার্থনায় তোমার চিত্তে অভূতপূর্ব এক মনোবলের সঞ্চার হইবে। আর কোন সংশয় সন্দেহ বা ভীতি বিহ্বলতা থাকিবে না। নিজে যেমন অন্যায় করিবে না, তেমনি অন্যায় প্রতিরোধে পশ্চাৎপদও হইবে না।

উপাসনা শক্তিসংগ্রহের একমাত্র উৎসস্থল সর্বশক্তিমানের স্মরণ না লইলে অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে রিপু ইন্দ্রিয়ের তীব্র তাড়নার মুখে আত্মরক্ষা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? ভগবানের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিও না।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি

যতই দুরাচারী বা কুমার্গগামী হওনা কেন, শুধু পতিতই নও, পতিতাধম হও না কেন, যদি একটিবার মনে প্রাণে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার, তবে আর তুমি ঘৃণিত থাকিবে না। পাপী বিল্বমঙ্গল, মাধবী গণিকা, মদ্যপ জগাই, মাধাই এবং গিরিশ ঘোষের যদি উদ্ধার হইতে পারিল, তবে তোমার না হওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। নির্ভরতার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। হে কিশোর ! একটি বৈদ্যুতিক আলো ঐ যে স্বমহিমায় প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সহিত তাহার যোগাযোগ। সেই যোগাযোগ একবার ছিন্ন হইয়া গেলে আর তাহার প্রকাশ শক্তি থাকে না। তেমনি ভগবানের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতিরেকে কাহারও জীবন আধ্যাত্মিক দিব্য বিভূতিতে বিকসিত হইয়া উঠে না। সুতরাং তুমি ঐ ভগবদ্ উপাসনার মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করিয়া চল।

অধ্যবসায়ঃ—

তোমার সাধনায় সফলতা লাভ হয়ত সহজ হইতেছে না। অসতর্ক মুহূর্তে পদস্খলন ঘটিয়া যাইতেছে। তাহাতে নিরাশ হইলে চলিবে না। বারংবার চেষ্টা করিতে হইবে। ছোট শিশু যখন হাঁটিতে শিখে দুই একবার পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়াও যায়। আবার উঠে আবার পড়ে। এই করিতে করিতেই দৃঢ় পদক্ষেপে চলিবার এবং তুরঙ্গ গতিতে ছুটিবার শক্তি একদিন আসে। তোমার সাধন পথে তুমি এখনও নিতান্তই শিশু। একাধ বার বিফলতা আসিলেই "যাঃ, আমার দ্বারা আর কিছুই হইবে না" বলিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়িও না। বিশ্বমিত্রের জীবন-সাধানায় তিন তিনবার তাঁহার গুরুতর পদস্খলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতেও বিচলিত হন নাই। আবার উঠিয়াছেন এবং পরম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উৎসাহ না থাকিলে উদ্যম আসে না। আমি মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিব। কুকুর, বিড়ালের মত ঘৃণ্য পশুর জীবন যাপন করিব না।" এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়া

উৎসাহ উদ্যমের উন্মেষ হয় না। হতাশ মানব কোন ক্ষেত্রেই সফলতা লাভে সক্ষম হইতে পারে না। নিরাশাকে বৈরাগ্য মনে করিও না। নিরাশা তমোগুণের লক্ষণ। রজোগুণের সাহায্যে সেই তমোগুণের উন্মূলন করিতে হইবে আগে। তবেই হইবে সত্ত্বগুণের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা। ক্রমে ক্রমে ধাপে ধাপে আগাইয়া চলিবার ইহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

অক্রোধ ঃ—

দার্শনিকের ভাষায় কাম শব্দের অর্থ কেবল যৌনানন্দের প্রেরণা নয়। প্রত্যুত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয়-ভোগের ইচ্ছাকেই কামনা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কামনার পূর্তিতে যেখানে ব্যাঘাত ঘটে, সেইখানেই হয় ক্রোধের উন্মেষ। এই ক্রোধ সংযম-সাধনার পথে এক বিকট প্রতিরোধ। কারণে অকারণে বা সামান্য কারণে হঠাৎ ক্রোধের উদ্রেক হইয়া বসে। তখন যে কি অবস্থা হয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়া থাকিবে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

> সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধঽভিজায়তে ॥
> ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
> স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

"কামনার পরিপূর্তির পথে যাহা প্রতিরোধক, তাহার প্রতি ক্রোধ সকলেরই হইয়া থাকে", এমন কথা মনে করিয়া ক্রোধের দুষ্পরিণামকে লঘু করিয়া দেখিও না। ধৈর্য এবং ভালবাসা এই ক্রোধ নিরসনের প্রধান দুইটি উপায়। ধৈর্য আর তিতিক্ষা একই কথা। মহান সঙ্কট সময়ে— প্রলোভনের দুর্বল মুহূর্তে অথবা আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনকে উদ্বেলিত হইতে না দিয়া তার সাম্যাবস্থা বজায় রাখার নাম ধৈর্য। একে তুমি সহিষ্ণুতাও বলিতে পার। এই সহিষ্ণুতাকে দুর্বলের লক্ষণ বলিয়া মনে করিও না, বরং ক্রোধই মানসিক অসুস্থতার একটি প্রধান লক্ষণ। মনে কর তোমার দেহের কোথাও একটি স্ফোটক হইয়াছে। সেই স্ফোটকে যদি অনবধানতা বশতঃ স্পর্শ ঘটিয়া যায়, তবে বেদনায় তুমি বিহ্বল হইয়া পড়। কিন্তু আরোগ্যলাভ করিলে ঐ স্থানে চপেটাঘাত করিলেও তেমন বেদনা অনুভূত হয় না। মন যদি সুস্থ সবল থাকে তবে অনেক বাক্যবাণ, কাম, ক্রোধাদির অনেক আক্রমণ তাহাকে উদ্বেলিত করিতে পারে না। মন যখন সহজেই অস্থির বা অভিভূত হইয়া পড়ে বা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন বুঝিতে হইবে মন সুস্থ নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য ক্রোধ করিয়া কাহাকেও কটুকথা বলিবার মধ্যে অথবা প্রহার করিয়া

প্রতিশোধ লওয়ার মধ্যে মানুষ পৌরুষ বা বীরত্বের বাহাদুরী অনুভব করিয়া থাকে। কামক্রোধ যাহার মনকে উদ্বেলিত করিতে পারে না তাহার মত বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বা ভারত যুদ্ধের ভীম, অর্জুনও নয়। সুতরাং সর্বতোভাবে ক্রোধ বর্জনের প্রচেষ্টা করিও। ক্রোধের সময়ে দেহে রক্ত অত্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং তাহাতে একপ্রকার বিষাক্ত রসের সঞ্চার হয় ফলে হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যায় এবং অত্যধিক উষ্ণতায় শুক্র তারল্য ঘটিয়া থাকে। একটি সাধারণ কথা বুঝনা কোন, একটি দিয়াশলা-ইয়ের কাঠি বিরাট দাবাদাহের সৃষ্টি করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু সকলের পূর্বে দগ্ধ হইতে হয় তাহাকেই। সুতরাং তেমন আত্মঘাতী ক্রোধের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটি কথা মনে রাখিও—যখনই মনে ক্রোধের সঞ্চার হইবে তখনই যাহার প্রতি ক্রোধ হইতেছে তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। মনকে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইবার জন্য অন্য কাহারও সহিত কথাবার্তায় লাগিয়া যাইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তির প্রতি তবুও বিদ্বেষ থাকিয়া যাওয়াটা স্বাভাবিক। সেই বিদ্বেষ দূরীকরণের জন্য মনে মনে তাহার

গুণাবলীর চিন্তন করিতে থাকিবে। দেখিবে কিছুদিনের মধ্যে ঐ ক্রোধের কারণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় এই ক্রোধকে নগণ্য বলিয়া মনে করিলে বিরাট ভুল করিবে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়েই দেখিতে পাইবে, পার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥

হে বার্ষ্ণেয়, মনুষ্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহার দ্বারা যেন পরিচালিত এবং বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়া পাপাচরণে নিযুক্ত হয় ?

উত্তরে ভগবান বলিলেন,—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥

হে অর্জ্জন, ইহা রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, দুষ্পূরণীয়, অত্যুগ্র কাম এবং ইহাই ক্রোধ। সংসারে ইহাকে মহাশত্রু বলিয়া জানিও।

এই প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুর বিনাশের জন্য তুমি তীব্র বিবেক-বৈরাগ্যরূপী সুশাণিত অসি, দৃঢ় সঙ্কল্পরূপ কঠোর

হস্তে ধারণ করিয়া প্রাণপণে প্রতিরোধ কর। গুরু কৃপায় শত্রুর বিনাশ করিয়া তুমি বিজয়ী হইবে।
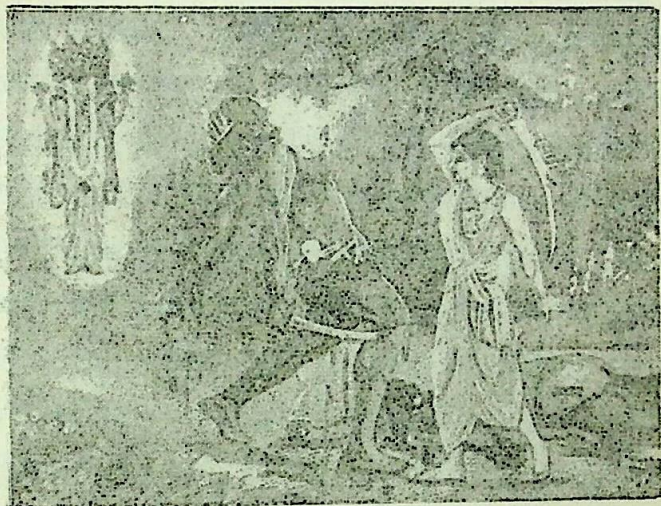
বিবেক, বৈরাগ্যরূপী অসিদ্বারা কাম, ক্রোধের বিনাশ কর—

হে কিশোর! তুমি হয়ত বলিতে পার উপাসনা প্রকরণে আপনিই ভো মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি বলিয়া ভগবানের নিকট ক্রোধের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তবে এখন আবার অক্রোধ-সাধনার জন্য উপদেশ করিতেছেন কেন? হে কিশোর! ভুল বুঝিও না। ক্রোধ এবং মন্যুর মধ্যে বিরাট ব্যবধান। ক্রোধের উৎপত্তি

কামের প্রতিরোধ হইতে। কিন্তু মন্যুর উন্মেষ হয় পুণ্যের প্রকোপে এবং রিপু ও ইন্দ্রিয়ের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায়। মন্যুকে সাত্ত্বিক ক্রোধও বলিতে পার। কয়েক বার হয়ত তুমি সংযম-সাধনায় নিষ্ফল হইয়াছ, নিজের মনের উপরই তোমার বিরাট ক্রোধ জন্মিল, "মন আমার দাস, না আমি মনের দাস? আমার মনকে আমি বশে রাখিতে পারিব না? আমার ইন্দ্রিয় আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করিবে? যাহার বিড়াল তাহাকেই ম্যাঁও?" এই বলিয়া মনের উপর ক্রোধ করিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত তাহার বৃত্তি নিচয়ের যে দমন ও দলন তাহাই সাত্ত্বিক ক্রোধ বা মন্যু। সাধন জীবনে এই মন্যুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মাতা পুত্রের অনেক প্রকার কুঅভ্যাস অবলোকন করিয়া নির্দয়তার সহিত তাহাকে শাসন করিয়া থাকেন, তাহাকে তুমি কেবল ক্রোধ বলিলে অন্যায় করা হইবে। ঐ ক্রোধের পশ্চাতে রহিয়াছে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টির এক শুভ সঙ্কল্প। ঐ মন্যু করুণা প্রসূত। করুণাময় সদ্‌গুরুকে আশ্রিত অনুগত শিষ্যের প্রতি কঠোর শাসন এবং কখনও কখনও ক্রোধ করিতেও দেখা যায়। তাহা কিন্তু ঐ ক্রোধের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। ক্রোধের পরম্পরা ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষানু ক্রমেও চলে, কিন্তু মন্যু অত্যন্তই ক্ষণস্থায়ী

ব্যাপার। সুতরাং এই উভয়ের পার্থক্য অনুধাবন করিয়া ক্রোধের পরিহার কর।

প্রতিভা :—

হে কিশোর! তেজস্বিতা বা প্রতিভার বিকাশ ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার এক প্রত্যক্ষ ফল। তুমি সংযমী জীবন যাপন করিতেছ, অথচ সেই সঞ্চিত শক্তির সদ্ব্যবহার দেশ, ধর্ম বা রাষ্ট্রের সেবায় কখনও করিলে না, এই ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠার কোন নৈতিক মূল্য নাই। তথাকথিত ভাল ছেলেটি হইয়া ঘরের কোণে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকিবার মনোবৃত্তি নির্জীবতারই লক্ষণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন :— "Expansion is life, Contraction is death" বিস্তারই জীবন, সংকোচই মৃত্যু। যেই জীবনে বিকাশের স্ফুরণা নাই তাহাকে জীবন বলা যাইতে পারে না। সুতরাং পড়াশুনায়, খেলাধূলায়, কাজে-কর্মে, সেবায়-সংগঠনে সর্বত্রই সেই প্রতিভার পরিচয় থাকা চাই। পিছাইয়া পড়ার এবং পালাইয়া বাঁচিবার মনোভাব জীবনের লক্ষণ নয়। সেই ক্ষেত্রে ধৈর্য সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়া ভাল ছেলে সাজিবার প্রচেষ্টা ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ কাল অনেক ছেলেকেই ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাবনা লইয়া গুরুগৃহে আসিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতে দেখা যায়। কিন্তু এও দেখা

যায় যে, তাহারা জপ-ধ্যান, সাধন-ভজনের কথায় একেবারে পঞ্চমুখ। কিন্তু পড়া শুনা, আশ্রমের কাজ কর্ম, গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষা, এমন কি পূজার্চনার কাজে কর্মে এবং জনহিতকর কার্যে তাহাদের কিছু মাত্র উৎসাহ উদ্যম নাই। চুপটি করিয়া বসিয়া থাকার মধ্যেই সাধনার স্বার্থকতা রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের ধারণা। হাঁ, এমন একটি অবস্থাও আসে যখন আর কোনই কর্তব্য থাকে না। কিন্তু তাহা সাধনার প্রথম স্তরের কথা নয়, সিদ্ধাবস্থায় চরম স্তরের স্থিতি। যেখানে সাধনার প্রথম স্তরেই এই সকল তোতা-ময়নার বুলি আওড়ানো আরম্ভ হয় এবং সর্বক্ষেত্র হইতে পলায়নপরতার লক্ষণ দেখা যায়, বুঝিতে হইবে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। শাস্ত্রমর্যাদাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাবের ঘরে চুরি চলিতেছে এবং ভণ্ডামি প্রশ্রয় পাইতেছে এই সম্পর্কে সাধু সমাজে একটি ছড়া প্রচলিত আছে।

ঘরমে হুয়া খট্ পট্, চলে বাবাজীকে মঠ পর।
বাবাজীনে বাতায়া কাম, হম্ সন্ত রমতে রাম॥

অর্থ হইল—ঘরে কোন রকম বৈমনস্য হওয়ার কারণে শ্মশান-বৈরাগ্য জাগিল। তখন গা বাচাইয়া চলিবার মানসে বাবাজীর আশ্রমে গিয়া আশ্রয় নিল। কিন্তু বাবাজী যখন সেবার কথা বলিলেন, তখনই "আমি তো রমতে রাম"

বলিয়া ভবঘুরে সাজিলেন। সাধু সমাজের সর্বত্রই আজ প্রায় এহেন দুর্গতি। চব্বিশ ঘণ্টা সাধন-ভজন কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সাধনভজনের ফাঁকে ফাঁকে আশ্রমের সেবা, গুরুসেবা, জনসেবা সব কিছুতে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে হয়।

সেবা :—

হে কিশোর! সেবার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল, সুতরাং সংযম-সাধনায় সেবার মহত্ব সম্পর্কেও জানিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তোমার সাধনা অধ্যয়নে সামিত। কিন্তু তুমি যদি সংযম-সাধনার পথে চলিতে ইচ্ছা করিয়া থাক তবে মনকে কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত রাখিতেই হইবে। জানতো? "Empty mind is devil's workshop." বেকার মন শয়তানের কারখানা। সুতরাং মন যখন অবসর পাইবে তখনই তোমাকে টানিয়া নিয়া চলিবে বিষয়ের নরক-কুণ্ডে। অধ্যাত্ম বিচার সদ্‌ভাবনা ইত্যাদি দ্বারা মনের গতিরোধের কথা পূর্বে বলিয়াছি। সকল সময়েই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং বিকল্প প্রক্রিয়ার কথা তোমার জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন! জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে অনেক প্রকার আবিলতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম

হইবে। দয়া এবং সেবার ক্রিয়াগত ব্যবধান না থাকিলেও বৃত্তিগত একটু ব্যবধান আছে। যখনই তুমি কাহারও প্রতি দয়া করিতে যাও, তোমার মনে দয়িত ব্যক্তির প্রতি একটু হীনমন্যতা না আসিয়া পারে না। কারণ জলধারার মত কৃপা, করুণা ও দয়ার ধারা উত্তমর্ণ হইতে অধমর্ণের দিকেই হয় প্রবাহিত। দয়িত ব্যক্তি এবং সেবিত ব্যক্তি সমানভাবে উপকৃত হইলেও দয়ালু এবং সেবক এই উভয়ের ফল প্রাপ্তি একরূপ হয় না। কেননা যাহার সেবা করা হয় তাহাকে আপনা হইতে উত্তম, পূজ্য এবং বরেণ্য জানিয়াই সেবা করিতে হয়। সেবকের চরিত্রে আসে দীনতা ও নম্রতা। পক্ষান্তরে দয়ালুর হৃদয়ে দম্ভের আবির্ভাবের আশঙ্কা থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং দয়া না করিয়া সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিও।

তুমি যাহাকে সেবা করিতেছ তাহাকে সাধারণ প্রাণী বলিয়া বিবেচনা করিও না। আজ তোমার সেবা গ্রহণ করিয়া তোমার জীবন ধন্য করিবার জন্য করুণাময়েরই শুভ পদার্পণ ঘটিয়াছে বলিয়া তুমি মনে করিও। তিনিই সর্বান্তর্যামী সুতরাং তোমার সেবার ক্ষেত্র যেন সংকীর্ণ হইয়া না পড়ে। আকীট ব্রহ্ম পর্যন্ত যাহাকে যেখানে দুঃস্থ দেখিতে পাও তখনই তাহার সেবায় যেন তোমার

করযুগল সম্প্রসারিত হয়। তুমি হয়ত বলিবে "সেবার সুযোগ না পাইলে কি সেবা করা যায়? দেশে ভূমিকম্প মহামারী, জলপ্লাবন ইত্যাদি দৈবত্নর্বিপাক দেখা দিলে তখন কোন সঙ্ঘ সমিতিতে যোগদান করিয়া দল বাঁধিয়া Volunteery করিলে একটা বিরাট কিছু করা হইল। কিন্তু তাহাছাড়া কোথায় কাহার সেবা করিতে যাইব?" কিন্তু কিশোর! তোমার সেবার সুযোগ লাভের জন্য এইভাবে মহামারী আদি দৈব দুর্যোগের আহ্বান করিও না। ঐ সেবার আড়ম্বরের দ্বারা সেব্যের সুবিধা লাভ ঘটিলেও সেবকের জীবনের মালীন্য দূরীভূত হয় না। বরং সরিষার মধ্যে ভূত প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। তুমি যদি সত্যই সেবা করিতে চাও, যেই দিকে চোখ ফিরাইবে সেই দিকেই দেখিতে পাইবে কত আর্ত, দুঃস্থ করুণ নেত্র মেলিয়া তোমার দিকে সাহায্যের আশায় তাকাইয়া রহিয়াছে। সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা না থাকিলে সেবক হওয়া যায় না। তুমি হয়ত পথ চলিতেছ, পথের মাঝে পড়িয়া থাকা একটি প্রস্তরখণ্ডে হুচট্ খাইয়া কাহাকেও পড়িয়া যাইতে দেখিলে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকেরই হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়াছে, কেহই হয়ত মনে মনে নগর পালিকার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করা ছাড়া আর কিছুই করে

নাই। সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি নিজের হাতে পাথরটি সরাইয়া রাখ, তবে লোকলোচনের পরোক্ষে এক বিরাট জনসেবা হইল। পত্রিকায় পত্রিকায় তোমার ছবি সহিত বাহবা দিয়া হয়ত একটা রিপোর্ট ছাপা হইল না, কিন্তু তোমার আধ্যাত্মিক জীবনে এবং সংযম-সাধনার ক্ষেত্রে ঐ সেবার মূল্য অনেক। এমনতর অনেক সেবাই তুমি খুঁজিয়া পাইবে। পা ফস্‌কাইয়া পড়িয়া যাওয়া লোকটিকে তুলিয়া ধরিলে, কোন আর্তকে হাসপাতালে পৌঁছাইতে সাহায্য করিলে, কোন রোগীর সেবা করিলে; এমন অনেক সেবাতেই নিজেকে বিলাইয়া দিতে পার। তাহাতে চিত্তের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইবে। উদার উদাত্ত হৃদয়খানা জুড়িয়া কেবল স্নেহ, করুণা ও মুদিতার অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই মধু বর্ষিণী দৃষ্টি লইয়া যে দিকে তাকাইবে সব কিছুই মধুময় হইয়া উঠিবে। এই সেবার মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদন আছে। একবার যে তাহার আস্বাদ পাইয়াছে এ জীবনে আর তাহা ছাড়িতে পারে না। ঐ নেশা তোমাকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। সেবকের জীবনে কলুষ কাম-কথার বা চিন্তা ভাবনার অবসর কোথায়? হে কিশোর! যদি জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে সেবক হও। ঘরে পিতা

মাতার সেবা, পরে পরিবারের সেবা, ধীরে ধীরে পরিজন ও সমাজের সেবা। পাড়া ছাড়িয়া গ্রামের স্তরে আসিয়া গ্রাম সেবা, তারপর সহর, নগর, জিলা, প্রদেশ ও রাষ্ট্রের সেবা, অন্তিমে জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে শিব জ্ঞানে জীব মাত্রের সেবাই তোমার জীবন আদর্শ হউক। কিন্তু এখানেও ভাবের ঘরে চুরি হওয়ার অবসর রহিয়াছে। আজকাল দেশ সেবা ও রাষ্ট্র সেবার নামে যাহারা স্বয়ং-সেবক সাজিয়াছেন, তাহারা সকলের পরিবর্তে স্বয়ংএর (নিজের) সেবাতেই বিভোর বলিয়া স্বয়ং-সেবক। সেবক মিটিয়া গিয়া তাহারা পদমর্যাদা লইয়াই ভীষণ ব্যস্ত। এমন সেবক যদি প্রচারক হয়, তবে তাহাকে বরং প্রতারক বলাই ভাল। বাহিরে সেবকের ভড়ং, মুখে সেবকত্বের বুলি, অথচ অন্তরে প্রভুত্ব লাভের মহত্বাকাঙ্খা। আত্মনিরীক্ষণ করিরা দেখ, যদি এমন ভণ্ডামি তোমার মনেও বাসা বাঁধিরা থাকে, তবে এই মুহূর্তেই তাহার বাসা ভাঙ্গিতে হইবে। একটি গল্প বলি শুন :—

গল্প

গোবিন্দপুরের একজন নামজাদা সমাজ-সেবী ছিলেন সেবকরাম। প্রথম জীবনে সেবকরাম ছিলেন সত্যই সেবক। লোকের আপদে-বিপদে সকলের আগে রাত দুপুরেও সেবক

রামকেই বুক পাতিয়া দিতে দেখা যাইত। সেবার ক্ষেত্র প্রসারিত হইতে হইতে সেবকরাম ঐ অঞ্চলের এখন সংসদ সদস্য হইয়াছেন। রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচে এখন আর তাহার পক্ষে সেবার সময় সুযোগ ঘটিয়া উঠিতেছে না।

নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় এখন তাহার জন্যই বরং ভাড়াটিয়া স্বয়ং-সেবকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেবকরাম ধর্মকর্মের ধার বড় একটা ধারে না। কিন্তু আজকাল পাঠে-কীর্তনে, মন্দিরে বা ধর্ম সভায়ও তাহার পদার্পণ ঘটিতেছে। গোবিন্দপুরের পাশেই গোমতী নদী প্রবাহিতা গোমতীর ঘাটের পাশে বৈষ্ণব সাধুবাবা জানকিদাসের ছোট্ট পর্ণকুটির। গোবিন্দপুরের আশে পাশে দশ বিশ ক্রোশ পর্যন্ত বাবা জানকিদাসের অত্যদ্ভূত ঋদ্ধি সিদ্ধির কথা লোক মুখে বহুল প্রচারিত। সুতরাং দর্শনার্থী ভক্ত সমাগমে আশ্রমটি সততই থাকে কল কল্লোলিত। এই নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় সেবকরামও এই সুযোগে ভক্ত সমাজে লোকপ্রিয় হইবার ফন্দি আটিলেন। বাবা জানকিদাসের আশ্রমে একদিন সদলবলে সেবকরামের আবির্ভাব ঘটিল। সেই সময় বাবা জানকিদাস নিজহস্তে গোবরমাটি দিয়া তাঁহার তুলসীমঞ্চ লেপন করিতেছিলেন। এই সকল সেবার কাজ তিনি প্রাণান্তেও অন্য কাহাকেও করিতে দিতেন না।

সেবকরাম ঠিক সেই সময়েই বাবাজীর দর্শনে আসিয়াছিল। আশ্রমে তখন ভক্ত-সমাগমের প্রাচুর্য দেখিয়া সেবকরাম বিনয়াতিশয্যে "এই সেবককে যেন ভুলিয়া যাইবেন না বাবাজী, আমাকে সেবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আশ্রমের সেবায় লাগিতে পারিলে জীবনকে ধন্য মনে করিব। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া অমাকে কৃতার্থ করুন বাবাজী।" এইরূপ অনেক কথাই বারংবার বলিতে লাগিল। বাবা জানকিদাস যতই নিষেধ করেন সেবকরামের সেবার আগ্রহ ততই যেন বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে একবার বাবাজী বলিলেন "আচ্ছা দেখ আমার লেপার গোবর ফুরাইয়া গিয়াছে। তুমি আমার গোশালা হইতে দুই হাত ভরিয়া এক আজল গোবর আনিয়া দাও।" এমন একটা সেবার কথা শুনিয়া সেবকরাম যদিও মনে মনে বড়ই বিরক্ত, তথাপি নির্বিচারে গোবর লইয়া আসিল। কিন্তু গোবর রাখিতে না রাখিতেই বাবাজী পাঠের আসন হইতে গীতাখানা লইয়া আনিতে হুকুম করিলেন। সেবকরাম বলিল ঃ—"বাবাজী একটু হাত ধোয়ার জল।" বাবাজী বলিলেন ঃ—"আরে বাবা হাত ধুইবে পরে আগে আমার গীতাটি নিয়া আস।" সেবকরাম বলিল "বাবাজী এই গোবর মাখা নোংরা হাতে গীতাখানা ধরিলে গীতাখানা নোংরা

হইবে না কি ?" বাবা জানকিদাস বলিলেন—"সেই কথা কি সত্যিই তুমি বুঝ ? রাজনীতির রাগদ্বেষপূর্ণ নোংরা মন লইয়া জন-সেবার ভড়ং করিয়া এই যে হাজার হাজার লোককে ঘাটাঘাটি করিতেছ, তাহাতে তাহাদের ঐ সরল মনগুলি কি নোংরা হইয়া যাইবে না ? বাচ্চা ! গীতা ধরিতে যেমন নোংরা হাত ধুইয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে, তেমনি সেবক সাজিতে হইলেও চিত্তের নির্মলতা সাধনের একান্ত প্রয়োজন সর্বাগ্রে।" জনসেবার মুখোস পরিয়া বাবাজীর কাছে চালাকি চলিল না দেখিয়া সেবা-দম্ভী সেবকরাম সেইদিন লজ্জায় অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। হে কিশোর ! এমনতর সেবা সংযম-সাধনার দুর্লঙ্ঘ্য বাধক লইয়া দাঁড়ায়।

গুরুসেবা

পূর্বেও বলিয়াছি আবারও বলিতেছি, নাবিক বিহনে যেমন নৌকা চলে না, সারথি বিহনে রথও চলে না, চালক বিহনে যেমন বিমান চলে না তেমনি সদ্গুরুর সাহায্য ব্যাতিরেকে সাধকের জীবন চলে না। সদ্গুরু সমাশ্রয়ের কথা তো শুনিয়াছ। কিন্তু ঐকান্তিক গুরু শুশ্রূষা ভিন্ন তাহার অনুকম্পা লাভের অন্য কোন উপায় নাই। এই সম্পর্কে মহাভারতের প্রারম্ভেই গুরুভক্ত উদ্দালক, আরুনি, বেদ,

উপমন্যু, জাবাল, উতঙ্ক এবং একলব্যাদির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। সেইগুলি শ্রদ্ধাসহকারে পড়িও এবং জীবনের আদর্শরূপে তাহাকে গ্রহণ করিও। এই বিষয়ে এই লেখকের লেখা ও সাধন-পথ প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত "সদগুরু-শরণে" গ্রন্থখানি পড়িও।

স্বাধ্যায়

গুরুকৃপা লাভের পরে সংযম-সাধককে শাস্ত্রকৃপা লাভের জন্যও প্রচেষ্ট হইতে হয়। স্বাধ্যায় জীবন গঠনের এক অনিবার্য উপকরণ। প্রাণান্তেও নাটক নভেল পড়িও না। তোমার মনে কামোত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন সব নোংরা সাহিত্য হইতে সযত্নে সরিয়া থাকিও। সেগুলি তোমাকে জঘন্য নরককুণ্ডে অধঃপাতিত করিবে! গ্রন্থালয় হইতে তোমার অবসর সময়ে পড়াশুনার জন্য বাছাই করা ভাল ভাল বই আনিবে। অশ্বিনীদত্তের ভক্তিযোগ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দের লেখা গ্রন্থাবলী শঙ্কর নাথ রায়ের "ভারতের-সাধক", পরিব্রাজক স্বামী কৃষ্ণানন্দের বক্তৃতাসমূহ ও শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি, স্বামী পূর্ণানন্দের বেদবানী, রামদয়াল মজুদারের মনোনিগ্রহ এইসব বইগুলি তোমাকে খুবই সাহায্য করিবে। তাছাড়া আরও অনেকানেক মহাপুরুষের উপদেশ বাণী রহিয়াছে, সেইসব

বাছিয়া বাছিয়া পড়িও। ভারতের বীর কথা, রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর দেশপ্রেম—ভারত মাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে যাহারা শহীদ হইয়াছেন তাহাদের জীবন কথা তোমাকে মানুষের মত মানুষ হইতে প্রেরণা জোগাইবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর ইতিহাস পড়িয়াও আনন্দ পাইবে। কিন্তু প্রাণান্তেও ডিটেকটিভ নভেল ছুঁইবে না। এগুলির মত বিকৃত সাহিত্যই সমাজকে আজ অনাচার ও দুর্নীতির এই চরম সোপানে ঠেলিয়া দিয়াছে। একটা কথা আছে মানুষটি কেমন বুঝিতে হইলে তাহার লাইব্রেরী দেখ। কথাটির মধ্যে তাৎপর্য আছে। একটি লোক কি ধরণের গ্রন্থ পড়ে তাহা দেখিলেই তাহার রুচি ও প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়া যায়। যে বিজ্ঞানের ছাত্র বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং সাময়িক পত্রের প্রাচুর্য তাহার পুস্তকালয়ে থাকিবেই। চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহার রুচি, তাহার পুস্তক সংগ্রহে চরক, সুশ্রুত বা হ্যানিম্যানের গ্রন্থ অবশ্য মিলিবে। সেই একই সূত্রে তুমি যদি সংযম-সাধক হও, তবে তোমার পুস্তকালয়ে না হউক অন্ততঃ পাঠ্য তালিকায় থাকিবে ঐ সাধনার সহায়ক গ্রন্থনিচয়ের নামাবলী। অধ্যয়নের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে অনেক কলুষিত চিন্তা চেষ্টা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। কেবল পড়িয়া

যাওয়ার মধ্যেই সর্বাঙ্গীন স্বার্থকতা নিহিত নয়। স্বাধ্যায়ের পরে মনন এবং নিদিধ্যাসনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নিত্য নিয়ম

হে কিশোর! মানব জীবন যদি সুশৃঙ্খল না হয় তবে সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠে না। অযত্ন সম্ভূত বন জঙ্গল এবং সুপরিকল্পিত পুষ্পবাটিকার মধ্যে বিরাট ব্যবধান। তোমার জীবনকে নিয়ম তান্ত্রিকতার মধ্যে আনিয়া যদি সুশৃঙ্খলিত করিতে পার তবে তোমার জীবনরূপ পুষ্প বাটিকার নন্দন বনে আসিয়া সারাজীবন অনেক গুণগ্রাহী আনন্দ আস্বাদন করিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তোমার সুবিধার জন্য নিত্য নিয়মের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। তুমি একটি ফলকে এই তালিকা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া লইও। তদনুপাতে চলিবার চেষ্টা করিতে করিতে একদিন অবশ্যই সফল হইবে।

তালিকা

প্রাতরুত্থান

প্রত্যুষে এক ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিবে। শয্যা ত্যাগ করা করিয়াই হঠাৎ উঠিয়া পড়িতে নাই। চোখ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে করুণা নিধান পরমপিতার নাম

স্মরণ করিবে। যতক্ষণ তোমার ইষ্টমূর্তিটি ধ্যাননেত্রে ভাসিয়া না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত শয্যা ত্যাগ করিবে না। প্রণাম ও আত্মনিবেদনের পর বাহিরে আসিবে।

শৌচ

পায়খানা যাওয়ার পর শৌচ ক্রিয়া সুচারুরূপে হওয়া চাই। শৌচক্রিয়া করিলে ও প্রস্রাবের পরে অনেকেই জল ক্রিয়া করে না। ইহা অত্যন্তই কুঅভ্যাস। বিষ্ঠা আপক্ষা মূত্র কোন অংশেই কম নোংরা বা বিষাক্ত নয়। সুতরাং সদা সর্বদা ঐ জল ক্রিয়ার অভ্যাস করিও। তারপর মুখ প্রক্ষালন। এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি বড়া ভাজিও না। নিম বা বাবুলের দাঁতন অথবা বৈজ্ঞানিক পেষ্ট, পাউডার দ্বারা দাঁতের এপিঠ ওপিঠ পরিষ্কার করিয়া ভাল ভাবে জিভ ছুলিবে। সংযম-সাধনার এইটিও একটি অঙ্গ।

ব্যায়াম

শৌচাদির পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা শারীরিক ব্যায়াম করিবে। ব্যায়ামের মধ্যে যৌগিক আসন। প্রাণায়াম সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা সাত্ত্বিক ব্যায়াম। সূর্যপ্রণাম বা কিছু কিছু ডন-বৈঠক জাতায় ব্যায়ামও করিতে পার। তবে আসুরিক ব্যায়ামের দিকে বেশী অগ্রসর না হওয়াই ভাল। তাহাতে রজোগুণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং লেখা পড়ায় ও

শ্লথতা আনিয়া দেয়। ব্যায়ামের ফলে শরীর থাকে নিরোগ। উষ্ণরক্তের ধারা দ্রুত গতিতে ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া দেহকে স্ফূর্তিময় এবং অনলস করিয়া রাখে। ব্রহ্মচর্য প্রতিপালনের অদম্য উৎসাহ এই ব্যায়ামের সঙ্গে জড়িত। দেহটি প্রাণায়াম ও ব্যায়ামের ফলে সুঠাম হইয়া গড়িয়া উঠে। ব্যায়ামের পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন। ঘর্মাক্ত কলেবর লইয়া তখনই ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে জীবনসঙ্কটের সম্ভাবনা। সর্দি, কাসি তো বটেই এমন কি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিউমুনিয়াদির মত মারাত্মক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

প্রাতঃস্নান

সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রাতঃস্নান শেষ করা উচিত কখনও উষ্ণ জলে স্নান করিবে না। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে অন্য কথা। বয়োবৃদ্ধদিগকে এই পর্যায়ে না ফেলাই ভাল। প্রাতঃ স্নানের ফলে স্নায়ুমণ্ডল স্নিগ্ধ থাকে দৈহিক উত্তেজনার কারণগুলি প্রশমিত হয়।

প্রার্থনা

সূর্যোদয়ের পরে তোমার পড়া শুনায় ব্যাঘাত না করিয়া ১৫।২০ মিনিট সন্ধ্যা বন্দনা অথবা গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপে নিমগ্ন

থাকিও। তাও যদি সৌভাগ্যে না ঘটে তবে ভগবানের ধ্যানে মনকে একাগ্র করিবে।

অধ্যয়ন

এইবার পড়াশুনার কথা। সকালে অন্ততঃ তিনটি ঘণ্টা একাগ্রমনে পড়াশুনা কর। যথাসময়ে একটু জলযোগ করিয়া লইও। কথাটি মনে আছে তো? "Work while you work, play while you play. That is the way to be happy and gay." কথাটির তাৎপর্য হইল যখন যা করিবে নির্ভেজাল ঐকান্তিকতার সহিত করিবে। 'ধান ভানতে শিবের গীত' যেন গাহিও না। পড়াশুনার সময়ে বন্ধু বান্ধবের সহিত জটলা করা অত্যন্ত হানিকর কুঅভ্যাস। যদি তুমি দশটায় স্কুলে যাও, তবে নয়টায় পড়া শেষ কর। ঐ এক ঘণ্টা তোমার স্নানাহারের ফাঁকে কিছুক্ষণ ঘরের কাজ করিয়া দাও। আহারের সম্পর্কে তো আগেই লিখিয়াছি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিও।

বিদ্যালয়ে

হয়ত সকাল এগারটা হইতে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তোমাকে বিদ্যালয়ে থাকিতে হয়। ঐ সময়টুকু শিক্ষকের সাহচর্যে তোমার অধ্যয়ন সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া লইও। বিদ্যালয় কিন্তু বন্ধু বান্ধবের মিলন কেন্দ্রও বটে।

বন্ধু সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। বিদ্যালয়ের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া কিছু স্বল্পাহারের পরে একবার খেলারমাঠে যাইবে।

খেলাধুলা

খেলা-ধূলাটি ব্যায়ামেরই অঙ্গ। তবে এই খেলাধূলা যেন নির্দোষ হয়। তাই বলিয়া লুডু, ক্যারাম বোর্ড বা দাবা, পাশা খেলার মত অলস খেলা খেলিয়া লাভ নাই। শরীর চর্চা হয় তেমন কিছু মনোরঞ্জক খেলা-ধূলা কর। সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছু সময় বাহির করিয়া লইয়া ঘরের সেবা করিতেও ভুলিও না।

সান্ধ্য প্রার্থনা

সান্ধ্য প্রার্থনাটি পারিবারিক সমবেত প্রার্থনা হওয়া ভাল। তুলসীতলায় অথবা ঠাকুরের আসনে ধূপ প্রদীপ জালিয়া দিয়া পনের, বিশ মিনিট কাল মাতা পিতা, ভাই, বোন সকলকে নিয়া নাম কীর্তন, স্তোত্র পাঠ ইত্যাদি অথবা ভবসাগর গুরু-কীর্তন করিও। তাহাতে পারিবারিক পরিবেশ পবিত্র হইয়া উঠিবে।

অধ্যয়ন

সন্ধ্যার পর অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বা আড়াই ঘণ্টা লেখা পড়া প্রয়োজন।

নৈশ আহার

নৈশ ভোজনটি অধিক রাত্রিতে না করাই ভাল। রাত্রির আহার কোন মতেই যেন পেট ভরিয়া না কর। দশটার মধ্যে শুইয়া পড়িবে।

রোজ নিশি

শয়নের পূর্বে ডাইরী লিখিবে। সারাটি দিন রুটিন অনুযায়ী চলিয়াছ কি না ? কুসঙ্গের প্রসঙ্গ আসিল কি না ? তাহা হইতে আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলে কি না ? কখনও মিথ্যা বলিলে কি না ? ক্রোধ করিলে কি না ? কুদৃশ্য দেখিয়া বা অশ্লীল সাহিত্য পড়িয়া তোমার লক্ষ্যচ্যুতি হইল কি না? কাহারও সহিত অবিনয় হইল কি না ? অখণ্ড ব্রহ্মচর্য প্রতি-পালিত হইল কি না ? ইত্যাদি ইত্যাদি সকল কথাই ঐ ডাইরীতে স্থান পাওয়া চাই। ভাল মন্দ যখন যে ভাবনা মনে আসিয়া থাকে তাহা সবই লিপিবদ্ধ করিও। সেইটি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার হইবে। কাহাকেও দেখাইবে না। কখনও কখনও আত্ম নিরীক্ষণের জন্য ডাইরীর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া নিজের জীবনের সিংহাবলোকন করিও। কিন্তু সাবধান ডাইরীতে যেন কখনও সত্যের অপলাপ করিও না। কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া লিখিও না। তাহাতে ডাইরী লিখিবার উদ্দেশ্যেই নষ্ট হইয়া যায়।

শয়ন

শয়নের পূর্বে পদ্মাসন করিয়া দশ মিনিট ইষ্ট চিন্তন করিবে। শয়ন সম্পর্কে পূর্বে লিখিয়াছি বলিয়া এইখানে শুধু এইটুকু উল্লেখই যথেষ্ট হইবে যে, যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ ঈশ্বর চিন্তন ভিন্ন অন্য কোন কথাই যেন চিন্তা না কর। এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইবে যে, তুমি যেন জগন্মাতার অভয় অঙ্গে মাথা রাখিয়া নিঃসঙ্কোচে ঘুমাইতেছ। তাহা হইলে আর কোন দুঃস্বপ্ন আসিয়া তোমাকে বিব্রত করিতে পারিবে না। স্বপ্নদোষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে এই পদ্ধতি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবে।

উপসংহার

হে কিশোর! সংযম-সাধনাই-জীবন সাধনা। কালের প্রবাহে ভোগের আবিলতায় জীবন-তরণী ভাসাইয়া দিয়া গতানুগতিক জীবন যাত্রার মধ্যে কোন বাহাদুরী নাই। সুতরাং আজ মানুষের মত মানুষ হইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা যারা রাখে, স্বদেশ এবং স্বধর্মের বেদীমূলে যারা উচ্ছৃষ্টপ্রাণ এমন কিছু উৎসাহী যুবকেরই বিশেষ

প্রয়োজন। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে ভারতের তরুণ দল একবার হাসিতে হাসিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। আজ ধর্মের বেদীমূলে ভোগ বিলাসিতা বলিদানের আবশ্য-কতা আসিয়াছে। ত্যাগ-তপস্যার আদর্শে অনুপ্রাণিত ভগবান বুদ্ধ, শঙ্কর ও চৈতন্যের মত বিপ্লবী-সন্ন্যাসীর আজ একান্ত প্রয়োজন। এই সন্ন্যাসী সমাজই অধঃপতনের মুখ হইতে ভারতকে বারংবার রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। অদ্যকার সমস্যা অতীতের সকল সমস্যাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার গতিরোধে বুক পাতিয়া দাঁড়াই-বার মত সর্বত্যাগী তরুণ সমাজের বিশেষ প্রয়োজন। নিজেকে লইয়া যাহারা ব্যাপৃত ও বিব্রত, নিজের মুক্তিটুকুই যাহাদের একমাত্র কাম্য, দেশ, ধর্ম ও সমাজকে উপেক্ষা করিয়া যেন কেন প্রকারেণ জীবনটুকু কাটাইয়া দেওয়ার মত রুচি সম্পন্ন পেটকে ওয়াস্তে রুটিরাম সাধুর অভাব আজ নাই। কিন্তু সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ, সকলের জাগরণেই নিজের জাগরণ, এমন উদাত্ত ভাব-ধারাও আবার দেখা দিয়াছে! সেই অভাব পুরণের জন্য আজ এই পঞ্চাশ কোটি জনবহুল ভারতে কমপক্ষেও পাঁচ লক্ষ ত্যাগী সন্ন্যাসীর বিপুল বাহিনীর প্রয়োজন। সৈন্য দিয়া দেশ রক্ষা হইবে, কিন্তু ধর্মও সংস্কৃতি রক্ষার কাজে তোমরাই

হইলে যথার্থ সৈনিক। সমাজের কাছ হইতে কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্তে সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গুরুর আজ্ঞাকারী হইয়া সেবব্রত গ্রহণেই এই সৈনিক জীবনের শুভারম্ভ।

তোমাদের ভিতরে যেই দিব্য শক্তি অনুস্যূত রহিয়াছে তাহার বিকাশ প্রকাশের সুবর্ণ সুযোগ যাহাতে লাভ হয়, সেই জন্য পরমার্থ-সাধক সঙ্ঘ এক রাজনৈতিক গন্ধহীন আধ্যাত্মিক ভূমিকা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। এস! তোমরা তোমাদের বিলাসের বলিদান কর, বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ কর, স্বার্থের বলিদান কর, পরমার্থ-সাধক সঙ্ঘ তোমাকে পারমার্থিক সিদ্ধির পথে আগাইয়া নিয়া চলিবে। ব্রহ্মচর্যেই ব্রহ্মলাভ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সাধন-পথ প্রকাশনের গ্রন্থাবলী

১। বহুজন প্রশংসিত "সাধক সোপান"— ৫·০০

লেখক—স্বামী বিষ্ণু পুরী

সাধনার পথে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলার এক অপূর্ব পথ নির্দেশিকা। ভাষার মাধুর্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, ও তত্ত্বের বিশ্লেষণায় এক অপূর্ব গ্রন্থ।

২। সদ্‌গুরু শরণে— ১·৫০

লেখক—স্বামী বিষ্ণুপুরী

গুরুতত্ত্ব, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সদ্‌গুরুর লক্ষণ, শিষ্যের যোগ্যতা, সাধন-প্রণালী এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ের সরল সমীক্ষা। একটী কাহিনীর মাধ্যমে লেখা। একবার হাতে নিলে শেষ না করে উঠা যায় না।

৩। গীতগুচ্ছ—(ভক্তি-সঙ্গীত) ১·৫০

৪। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত—বাংলা ও হিন্দী ·৫০

৫। Paramarth-Sadhak Sangh. ·৫০

৬। মহিম্ন স্তোত্র—(হরিহর ব্যাখ্যাসহিত)

৭। পত্রে উপদেশ— ৮। গুরু গীতা

৯। সংযম সাধনা ১০। গল্পে গীতা

১১। কাব্য গীতা ১২। শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা